

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগীর

গ্রন্থাবলী

- ১। IRON IN ANCIENT INDIA ... Rs. 2/4
(To be had at the Indian Association for
the Cultivation of Science, 'No. 210 Bow-
bazar Street, Calcutta)
- ২। PRACTICAL INORGANIC CHEMISTRY Re. 1.
(To be had of all principal book-sellers.)
- ৩। আয়ুর্বেদ ও নব্য-রসায়ন (প্রথম ভাগ) ... ১।০
বাধাই ১।০
- ৪। বৈজ্ঞানিক-জীবনী (প্রথম ভাগ) ... ১।০
বাধাই ১।০
- ৫। তুফান (Humorous Essays) ... (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
চক্রবর্তী চার্টার্ড এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈজ্ঞানিক-জীবনী.

(প্রথম ভাগ)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম, এ, এফ, সি, এস,

প্রেরচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার,

রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ ।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ।

চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১।০

প্রকাশক

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

রাজসাহী ।

কান্তিক প্রেস,

২২নং স্কিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

শ্রীহরিচরণ মাস্তা দ্বারা মুদ্রিত ।

উৎসর্গ

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য

ও

বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠিকল্পে

দানে মুক্তহস্ত

কাশিমবাজারের মাননীয়

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

করকমলে

গ্রন্থকারের আন্তরিক শ্রদ্ধার

নিদর্শনস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্তৃক

সাদরে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানিতে আমি একদিকে সুশ্রুত, নাগার্জুন, অর্য্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ও গেলিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত ও কার্য্যাবলী সুবিদিত কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্যাবলী স্বল্পবিদিত বা অজ্ঞাত। সেই কারণে এই দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তের লিখনপদ্ধতির মধ্যে একটু বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইবে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্তগুলি একটু অসরল হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন কবিতা সম্যক বুঝিতে হইলে কবিকে জানা আবশ্যক, সেইরূপ কোনও বৃহৎ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্যক বুঝিতে হইলে উহার আবিষ্কারকে জানা উচিত। কিরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে সেই সত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বর্ণনা কেবল কৌতুহলোদ্দীপক নহে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপাদানও বটে। সেইজন্ত প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিবার সময় তাঁহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি, ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাই নাই; যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্ত তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ

সেই সত্য কিরূপে তিনি ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন তাহার বিবদ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই গ্রন্থখানিতে মাত্র কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের কার্যাবলীর পরিচয় আছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগে ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় ও জন ওয়াট, লিনিয়স, ওয়ালাস, কেলভিন প্রভৃতি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা আছে।

গ্রন্থখানির একটা ছোটগোছের নাম রাখিবার জন্ত “বৈজ্ঞানিক জীবনী” নামকরণ করিয়াছিলাম। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বলিতেছেন যে নামটা “বৈজ্ঞানিক-জীবনী” হইবে, কারণ তাহা না হইলে “বৈজ্ঞানিক” শব্দটা “জীবনী”র বিশেষণ হইয়া পড়ে। তাঁহাদের আপত্তিই ঠিক। যদি কোনোও কালে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যক হয় তাহা হইলে অত্যাশ্চর্য সংশোধনের সহিত এই ভুলটিও সংশোধিত হইবে।

এই গ্রন্থখানি গত দুই বৎসর ধরিয়া “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। “ভারতী”র মাননীয় সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থের তাবৎ ব্লকগুলি আমাকে দান করিয়া বাধিত করিয়াছেন। পুনশ্চ আফ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজা শ্রীধ্বজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই পুস্তক প্রকাশের জন্ত অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

রাজসাহী
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫

} শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ				
সূত্র	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ				
গৈলিলিও	২২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ				
ল্যাভোয়াসিয়ে	৫৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ				
মাইকেল ক্যারাডে	৮৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ				
নিউটন	১১৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ				
নাগার্জুন	১৪০
সপ্তম পরিচ্ছেদ				
আর্যভট্ট	১৫৩
অষ্টম পরিচ্ছেদ				
ডাকইন	১৬৭



বৈজ্ঞানিক জীবনী ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সূত্র ।

সে বহু শতাব্দীর কথা, যখন ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহতভাবে বহিয়া দাইতেছিল, যখন আপ্তবাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও প্রত্যক্ষের অনর্থাদা কখনই হইত না, যখন অনুষ্ঠানের তুর্ভেদ্য কারাগারের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর দ্বায় নিশ্চলভাবে মৃতবৎ অবস্থান করিত না—সেই হিন্দু স্বাধীন চিন্তার যুগে মহর্ষি সূত্র প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছিলেন। যে যুগে অস্থচিকিৎসা নরস্বন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি হইবার করুণাও অসম্ভব ছিল, যে যুগে মৃত শরীর-স্পর্শ ও শবাবচ্ছেদ একটা গুরুতর পাপের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, যে যুগে প্রবচন অপেক্ষা বাস্তবের সমাদর অধিক

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ছিল, সেই যুগে বহুস্তরিশিষ্য স্মৃশত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
হায় ! মহর্ষি বড় আশা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন “কুশলেনাভিপন্নঃ
তদ্ বহুপাভিপ্ৰবোধতি”---তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই।
ভারতের অদৃষ্ট দেবতার বৈগুণ্যে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া
গিয়াছিলেন তাহা অঙ্কুরিত না হইয়াই অকালে শুকাইয়া গিয়াছে।
প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে যখন হিন্দুসম্মান আবার মৃত শরীর
বাবুদের দ্বারা অস্বাভাবিক করিতে ইংরাজের বিজয়দুর্গ হইতে
মহানন্দকৃচক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এবং তজ্জন্তু সেই ভাগ্যবান
দ্বক স্বর্গদেব দেবতা এমে পূজিত হইয়াছিল জানি না হিন্দুর
চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জলন্ত উদাহরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিলে মহর্ষি স্মৃশতের অদম্য ক্ষোভে ও অপমানের কাটিয়া যাউত
কি না।

শারীরবিজ্ঞান উৎপত্তি।

স্মৃশতসংহিতায় যে উন্নত শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসার
পরিচয় পাঠ তাহার উৎপত্তি বৈদিক সাহিত্যে। যেমন অথর্ববেদ
কায়চিকিৎসার আদিগ্রন্থ, সেইরূপ সামবেদ অস্ত্রচিকিৎসার
উৎপত্তিস্থল। বৈদিক কালে বিবিধ পশুবাগযজ্ঞে নিহত পশুর বিবিধ
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হইত।
“নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শাসনায়ক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া
পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কৰ্ম করিত তাহার নাম
শমিত। যজ্ঞভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কৰ্ম নিষ্পাদিত হইত
সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেইখানেই অগ্নি জালিয়া পশুর
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার

নাম শামিত্ব অগ্নি।” (১) এইরূপে পশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে পরবর্তীকালের শারীরবিজ্ঞান উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও শ্রৌতসূত্র রচনাকালে এই সকল যজ্ঞের যেনন নিম্নুতি সাধিত হইয়াছে, নিহত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভাগ তেমনট আরও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আসিয়াছে। বেদোক্ত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে আয়ুর্বেদীয় অঙ্গবিনিশ্চয়বিজ্ঞান উৎপত্তি হইয়াছে এবং বেদোক্ত অনেক পরিভাষিক শব্দ আয়ুর্বেদে গৃহীত হইয়াছে।

সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল।

সুশ্রুত স্বর্গবৈদ্য ধাতস্ত্রির অবতার কাশীরাজ দিবোদাসের দ্বাদশ শিষ্যের অতঃপ। সুশ্রুত, উপধেনব, বৈতরণ, ওরন্ধ, পোদ্দলাবত, করবীরা, গোপূররক্ষিত, নিমি, কাঙ্ক্ষায়ন, গার্গ্য ও গালব—এই দ্বাদশ জন কাশীরাজের শিষ্য ছিলেন। ইহাদের অনেকেই নিজ নিজ নামে ভিন্ন ভিন্ন শলাতন্ত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল সুশ্রুতসংহিতাই প্রচলিত আছে। কিন্তু এককালে যে এই সকল শলাতন্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। টাঁকাকার শিবদাস চক্রদত্ত সংগ্রহের টাঁকায় গোপূররক্ষিত ও বৈতরণ কতৃক লিখিত শলাতন্ত্র

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী লিখিত “শরীরবিজ্ঞান পরিভাষা” প্রবন্ধ—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮, ২০৫। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মাধাক্ষিন বাজসনেয়ী সংহিতা, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ও আপস্তুত্র শ্রৌতসূত্র হইতে পশুযজ্ঞে নিহত পশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈদিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক জীবনী

ইহাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি সুশ্রুত-সংহিতার টীকায় পোঙ্কলাবততন্ত্র ইহাতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি একাদশ খ্রীষ্টাব্দের আয়ুর্বেদকার, শিবদাস তাঁহারও পরে, অতএব দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই সকল তন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল সঠিক নির্ণীত হয় নাই। “সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং” এই বাহ্যিকসূত্র তন্ত্রবায়ী সুশ্রুত খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পূর্বে প্রাচুর্য ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নবাবিস্কৃত বাউয়ার পাণ্ডুলিপি পাঠে জানা যায় যে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুশ্রুত অতি প্রাচীন আয়ুর্বেদকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সুশ্রুতসংহিতা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ নাগার্জুন কর্তৃক প্রতীক্ষিত প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতা। টীকাকার উল্লাসচরণের মতে নাগার্জুন সুশ্রুতসংহিতার উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা। সুশ্রুতের পর কয়েক শতাব্দী শল্যবিদ্যা সজীব ছিল। বাগভটের (তৃতীয় শতাব্দী) সময় শল্যবিদ্যা যে বিদ্যমান ছিল তাহা তাঁহার অষ্টাঙ্গ পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু বাগভটের পর ইহাতে ক্রমশঃ অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যা ও শল্যবিদ্যার অবনতি ঘটিতে থাকে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি বলিয়া মনে হয় :—

প্রথম—বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সহিত ভারতে স্বাধীন চিন্তার উন্নতি বহুলপরিমাণে সাধিত হইলেও “অহিংসা পরমোদ্যম” এই নৈতিক বাক্য শবব্যবচ্ছেদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জন্ত কায়চিকিৎসা বিশেষতঃ তান্ত্রিকচিকিৎসাপদ্ধতির বহুল উন্নতি সাধিত হইলেও বৌদ্ধযুগে অস্ত্রচিকিৎসা বড়ই অনাদৃত হইতে চলিয়াছিল।

সুশ্রুত

দ্বিতীয় পূর্বে ব্রাহ্মণগণই অণু অণু বিদ্যার গায় চিকিৎসা-বিদ্যার পঠনপাঠন করিতেন। মনুর অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া শবদেহস্পর্শ ক্রমশঃ একটা পাপের কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছিল, তাহার জ্ঞান প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শবদেহস্পর্শ ও বাবচ্ছেদ ব্যতিরেকে অঙ্গবিনিশ্চয় ও অঙ্গচিকিৎসা-বিদ্যা কখনই সজীব থাকিতে পারে না। সেইজন্ম এই “শুচি” শাস্ত্রের পরিণাম এই হইয়াছে যে ক্রমশঃ ভারতের উন্নত অঙ্গচিকিৎসাবিদ্যা নিম্নশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। সতাই মহাত্মা এলিফিনষ্টোন সাহেব এগনকার স্বদেশীয় অঙ্গচিকিৎসার অবনতি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন-
“bleeding has been left to the barber, bone-setting to the herdsman and the application of blisters to every man.”

সুশ্রুতোক্ত শারীরবিদ্যা।

সুশ্রুতোক্ত অঙ্গবিনিশ্চয়বিদ্যার সম্যক পরিচয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদান করা অসম্ভব। সুশ্রুতের শারীরস্থান পাঠ করিলে স্বতই মনে হয় যে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ দর্শন ভিন্ন একেবারে অসম্ভব ছিল। সুশ্রুত সপ্ত ত্বক (skin, epidermis), সপ্ত কলা (cellular tissues and fascia of the body), সপ্ত আশয় (organs or receptacles), অস্থ (intestines), নয়টি হাড়, ষোলটি কণ্ডুরা (রজ্জ্ববৎ শিরা), বারটি জাল (membranes), ছয়টি কূর্চ, চারিটা রজ্জু (tendons), সাতটি সেবনী (sutures), তিন শত অস্থি

বৈজ্ঞানিক জীবনী

(bones), দুই শত দশটি অস্থিসন্ধি (bone joints), নয় শত স্নায়ু (nerves), পাঁচ শত পেশী (muscles), সাত শত শিরা ও এক শত সাত মর্মস্থানের (vital parts) সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শরীরের কোন স্থানে কয়টি স্নায়ু, অস্থি, শিরা প্রভৃতি আছে তাহাও সঠিক নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিন শত অস্থির বিবরণ দেখুন

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিনটি		দুই পাশ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২টি
করিয়া	১৫টি	বক্ষে	৮টি
পা বা গোড়ালিতে	১০টি	বৃত্তাকার অঙ্গক নামক	২টি
জন্ডায়	১টি	গ্রীবাদেশে	২টি
জামুতে	২টি	কণ্ঠদেশে	৯টি
উরুদেশে	১টি	দুই হৃদুতে	৪টি
এইরূপ অপর পায়ে	৩০টি	দন্তে সর্বসমেত	৩২টি
দুই হাতে ৩০ করিয়া	৬০টি	শ্বাসিকায়	৩টি
কটিদেশে	১টি	তালুতে	১টি
মলদ্বারে	১টি	কর্ণ, গণ্ড ও শব্দদেশে ২টি করিয়া	৬টি
বোনিদেশে	১টি	মস্তকে	৬টি
দুই নিতম্বে	২টি		
পৃষ্ঠে	৩০টি	সর্বসমেত	৩০০ অস্থি

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভে দেখেন যে রক্তের গতি (circulation of the blood) আবিস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হার্ভের বহু শতাব্দীর পূর্বে সুশ্রুত যে রক্তের গতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—এ সংবাদ ইউরোপের বৈজ্ঞানিকগণের কর্ণে ভাল করিয়া পোবেশ করে নাই। রক্তের গতি সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়া

সুশ্রুত

গিয়াছেন যে “১৭৫টি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা রক্ত সমগ্র দেহে চলাচল করিতেছে। এই সকল শিরা যকৃত ও প্লীহা হইতে উদ্ভূত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শোণিত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যতক্ষণ স্বীয় শিরামধ্যে বিচরণ করে (circulates) ততক্ষণ বাতাসনুদায়ের পূরণ, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্পর্শজ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং অগ্নাত নানাপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই রক্ত দূষিত হইলে, রক্তজন্ম নানাপ্রকার পীড়া জন্মে।” রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারী বলিয়া হার্ভের নাম গৌরবান্বিত, কিন্তু রক্তের গতির আবিষ্কার প্রথমে ভারতে হইয়াছিল এ গৌরব ভারতবাসী নিঃসন্দেহে করিতে পারেন।

ভারতীয় অস্ত্রচিকিৎসার প্রাধান্য।

ছই এক পৃষ্ঠার মধ্যে সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসার সম্যক বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে, তবে সুশ্রুতের সময় অস্ত্রচিকিৎসা কিরূপ উন্নত ছিল তাহার আভাষমাত্র পাঠককে প্রদান করাই লেখকের উদ্দেশ্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখিতে পাই যে উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসকগণ সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে রানের সৈন্যবর্গের অস্ত্রচিকিৎসকরূপে সুশেন রানের সহিত লঙ্কায় গিয়াছিলেন। মহাভারতের উদযোগ পর্বে দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন উভয়েই অস্ত্র-চিকিৎসক ও অস্ত্রচিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী (bandage), ঔষধাদি সংগ্রহ করিতেছেন। পঞ্চপাণ্ডবের অগ্নিতম নকুল অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির অস্ত্রচিকিৎসা প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত সংস্কৃতভাষা ও ভারতের

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অস্ত্রচিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত অনেক বিষয়ে ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ওয়েবার লিখিয়া গিয়াছেন “ইউরোপের আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ হিন্দুদের নিকট হইতে একস্থান হইতে চন্দ্র লইয়া অত্যাধুনিক চন্দ্র সংযোগ করিবার উপায়, যথা কঙ্কিত নাসিকা জোড়া দেওয়া, (rhinoplasty) শিক্ষা করিয়াছেন।” প্রসিদ্ধ জার্মান ডাক্তার হির্সবার্গ (Dr. Hirschberg) ওয়েবার সাহেবের পূর্বোক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে “চক্ষের ছানিতোলা প্রক্রিয়া ইউরোপ ভারতবাসীর নিকট শিখিয়াছে, এবং প্রাচীন গ্রীক, নিশরবাসী বা অথ কোন জাতি উহা জ্ঞাত ছিলেন না।” আধুনিক অস্ত্রচিকিৎসকগণ অসাধাসাধন করিতেছেন, কিন্তু অধুনা যে সকল অস্ত্রচিকিৎসা অতি কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হয় (major operation) তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি; যথা ছানিতোলা, অঙ্গছেদন (amputation), উদর বিদারণ (abdominal section) প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না। আধুনিক পাশ্চাত্য অস্ত্রবিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলেরই চমৎকৃত হইবার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের উন্নত অস্ত্রচিকিৎসার গৌরবের যে আমরা উত্তরাধিকারী তাহা যেন কদাচ ভুলিয়া না যাই।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা।

১। শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গ ছেদন করা,) (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান

ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চৰ্ম্ম উন্মোচন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্ত শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীবা, বাধী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অগ্নেয়ণ করা), (৬) আহাৰ্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (শ্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসককে অস্ত্রক্রিয়াদি কৰ্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অবায়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্রক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কোতুহলোদ্দীপক উপায়ে গুরু শিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার অভ্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার খলি, মৃত পশুর প্রস্তাবের খলি বা চামড়ার খলির মধ্যে জল ও কর্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোমবৃন্ত চৰ্ম্ম আঁচড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহাৰ্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating fluids)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমুল কাঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপুঞ্জাদি শ্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চৰ্ম্ম হুটী দ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধাক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পক্ষের ডাঁটা বিধিয়া বেধাক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্মিত পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পক্ষের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকাণ্ড (cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসপেশের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়।

এইরূপে অঙ্গক্রিয়া সনাক্তরূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসা কার্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অঙ্গ প্রয়োগ করিবার পূর্বে চিকিৎসক তৎকর্মোপযোগী যন্ত্র, অঙ্গ, তুল্য, বস্ত্রপণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অঙ্গ করিতে হইলে রোগীর আহ্বারের পূর্বে অঙ্গ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অঙ্গ প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অঙ্গ করিবার পর অঙ্গুলির দ্বারা পুষ্পরক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিম্নপাতাদি কথায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান দৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রপণ্ডে মাখাইয়া উহা ক্ষতস্থানে পুরিয়া দিবেন ও তত্পরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাধিয়া দিবেন। তিন

দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদি
কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন।
এইরূপে বতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় তত দিবস ধৌত
করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

যন্ত্রের চিত্র



১। বস্তী যন্ত্র।



৩। সিংহমুখ যন্ত্র।



৫। নাজী যন্ত্র।



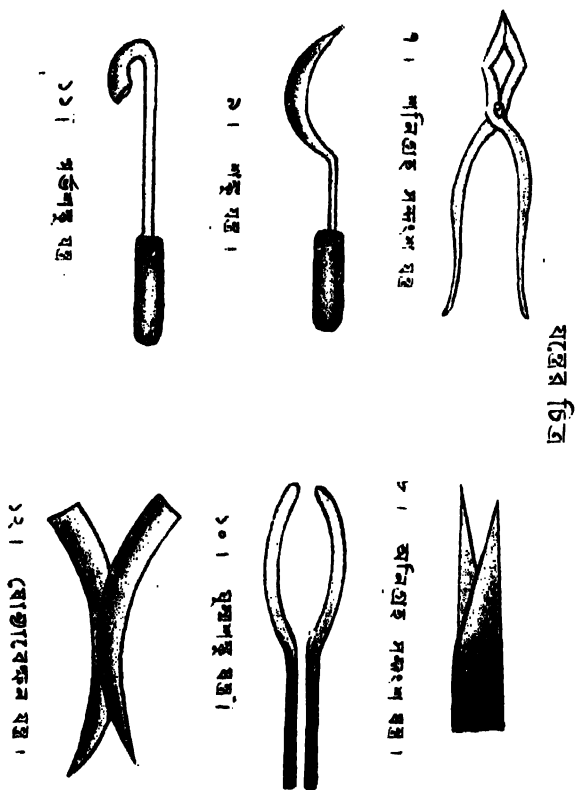
২। অর্শো যন্ত্র।



৪। উল্লম্ব যন্ত্র।



৬। শল্যাকা যন্ত্র।



২। যন্ত্র

অল্প প্রয়োগকালে স্মরণ্য ১২৫ প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায়

না। যন্ত্রগুলি আবার ছয় ভাগে বিভক্ত (১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার) (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ী যন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকা যন্ত্র (আটাইশ প্রকার), ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্মিত হইত। আবশ্যকমত অগ্ন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিক যন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দশ প্রকার পক্ষীর, সর্বসমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মূণের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র নির্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে উহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিক যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ণকারের সোড়ানার মত ও অপরটা ক্ষৌরকারের সন্ন্যাস মত। চন্দ্র, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ী যন্ত্র—নানা আকারে নির্মিত ও নানা কার্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকা যন্ত্র—আটাইশ প্রকার—শলাকা যন্ত্র বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্মিত হইত।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির চিত্র উপরে প্রদত্ত হইল।*

* যন্ত্র ও শস্ত্রের চিত্রগুলি প্রধানতঃ গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কৃত “A Short History of Aryan Medical Science” নামক গ্রন্থ সম্বন্ধিত চিত্র দৃষ্টে অঙ্কিত হইয়াছে।

৩। শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নপশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তমুখ, (১৩) ত্রিকূটক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ত্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) নেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদাক্রিয়া, ভেদাক্রিয়া, এবংক্রিয়া, দীবন প্রভৃতি পূর্বোক্ত অষ্ট প্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত। এই সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লোহের দ্বারা নিৰ্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তম রূপে পরিবার উপায়বিশিষ্ট ও দন্তবিশীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্র সকলের ধার যত্নভেদে মন্থরকলায়ের তায় স্থূল হইতে অর্দ্ধচুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্ত অস্ত্র শিমূলকাঠের খাপে রক্ষিত হইত এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্ত মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কয়েক প্রকার অস্ত্রের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কিরূপে তরুণ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বলে আমরা গর্তস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। “গর্তস্থ মৃতসন্তান হস্ত সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্তিণী ও

সস্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসস্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শস্ত্র (আকর্ষণী) অস্ত্রের দ্বারা থণ্ড থণ্ড থপ্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিষ্কাশিত করিবে। যদি মস্তক

শস্ত্রের চিত্র



১। কণ্ডুরিকা শস্ত্র।



৩। কুণ্ডল শস্ত্র।



৫। সূচি শস্ত্র।



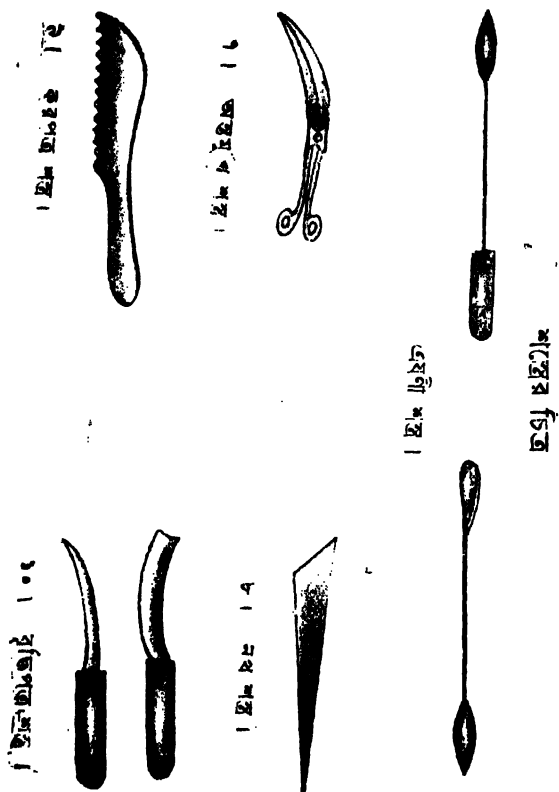
২। মণ্ডলাগ্র শস্ত্র।



৪। শর্যাবিমূখ শস্ত্র।



৬। সূচি শস্ত্র।



বিদীর্ণ করিতে না পারা যায় তাহা হইলে অঙ্গিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্বক্ৰদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্বক্ৰসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হইবে। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিত্তীর ছায় বায়ুপূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে

পারা যায়। জ্বনদেশ দ্বারা অপতাপথ অবরুদ্ধ হইলে, জ্বনদেশের অস্থিগুসকল ছেদন করিয়া নিকাসিত করিবে। মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নানক অঙ্গই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অঙ্গ প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।” হয়! অধুনা আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ীগণের নিকট গর্ভস্থ মৃতসন্তানের ছেদনের কল্পন্যও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অগ্ন প্রকার অঙ্গ কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমন দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অঙ্গচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

(৪) বন্ধন।

সুশ্রুতে অনেকপ্রকার বন্ধনের (bandage) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পতন বা কোনপ্রকার আঘাতের দ্বারা দেহের অস্থিসমূহ ভগ্ন হইলে বা অঙ্গপ্রয়োগের পর আহত বা ক্ষতস্থানে স্থানবিশেষে বিবিধ প্রকার বন্ধনের প্রয়োগ ছিল। বন্ধনপ্রণালী চতুর্দশ প্রকার—(১) কোশ, (২) দাম, (৩) স্বস্তিক, (৪) তম্ববেলিত, (৫) ছতোলী, (৬) মণ্ডল, (৭) সুগিকা, (৮) যজ্ঞক, (৯) খট্টা, (১০) চীন, (১১) বিবন্ধ, (১২) বিতান, (১৩) গোক্ষণা-ও (১৪) পঞ্চাঙ্গী। এই প্রবন্ধে তিন প্রকার বন্ধনের চিত্র প্রদত্ত হইল। বন্ধনকার্য্যে সূতার কাপড়, মেষলোমনিশ্রিত বস্ত্র, রেশমী কাপড়, চর্ম, বংশাদির চটা, সূতা, লৌহ, কাষ্ঠফলক প্রভৃতি বিবিধ উপকরণ ব্যবহৃত হইত। যে প্রকার বন্ধন শরীরের

স্থানবিশেষে স্নানবিষ্ট হয় সেই স্থানে সেই প্রকার বন্ধন প্রযোজ্য। স্থানবিশেষে বন্ধন তিন প্রকার—গাঢ়বন্ধন, সন্মবন্ধন ও শিথিল-বন্ধন। যে বন্ধন বেশ শক্ত অথচ যাহাতে বেদনা বোধ হয় না তাহা গাঢ়বন্ধন; যে বন্ধন ভিতরে ফাঁপা তাহা শিথিলবন্ধন ও যাহা খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে তাহাই সন্মবন্ধন।

গোফণা বন্ধন



পঞ্চাঙ্গী বন্ধন

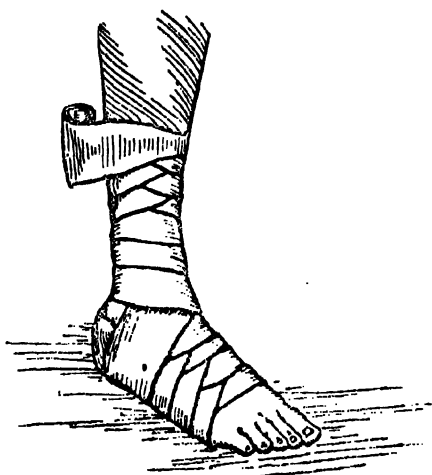


ক্ষার।

রাসায়নিকের পক্ষেও সুশ্রুত পরন আদরের সামগ্রী। সুশ্রুতের মৃদু, মধ্যম ও তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রকৃতপ্রণালী রসায়নের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরক ও সুশ্রুত উভয়েই সজ্জীকাক্ষার (carbonate of soda) এবং যবক্ষার (carbonate of potash) দুইটি পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপে এই দুইটি ক্ষার বহুদিবস পর্যন্ত একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল।

সুশ্রুত ক্ষারকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মৃদু (mild),
মধ্য(caustic) ও তীক্ষ্ণ। সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার বলিয়া যাহা বর্ণনা
করিয়াছেন তাহা ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে, তাহা মৃদুক্ষারে

স্বস্তিক বন্ধন



দস্তী, দ্রাবস্তী প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমরা মধ্য
ক্ষারকেই তীক্ষ্ণক্ষার অর্থাৎ caustic alkali বলিয়া ধরিয়া লইলাম,
কারণ “মধ্য” শব্দ ঠিক (caustic) শব্দের দ্ব্যতক নহে।

তীক্ষ্ণক্ষার—তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞান
সম্মত। ঘণ্টাপাকুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্ম জলে
গুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে ভস্মশর্করা, বিলুক, শঙ্খনাভি
অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ (caustic lime) পাওয়া যায়
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে পাক করিবে। মৃদুক্ষার ও

চূণ একত্রে জাল দিয়া এখনও তীক্ষ্ণকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণকার লৌহকলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। তীক্ষ্ণকার হীনবীৰ্যা (carbonated) হইয়া বাইটে পুনরায় চূণের সহিত জাল দিবার ব্যবস্থা আছে। সূক্ষ্মত ক্ষারের গুণ সঠিক ভাবেই দিয়াছেন- স্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল (soapy)।

তেজপ্রশমন। (neutralisation)- অম্লরসের (acids) দ্বারা তীক্ষ্ণকারের যে তেজপ্রশমন হয়, তাহাও সূক্ষ্মতের সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সূক্ষ্মত ইহার কারণ বলিয়াছেন যে ক্ষার দ্বারা লবণরস আছে, সেই জন্য অম্লরসের সহিত লবণরস সংযুক্ত হওয়াতে মাধুর্য্যগুণ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণতাবিহীন হইয়া থাকে। আধুনিক রসায়ন সপ্রমাণ করিয়াছে যে অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া একপ্রকার নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকে লবণ (salt) বলে। এই লবণজাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকাতে অম্ল ও ক্ষার সংযোগে তীক্ষ্ণতা দূরীভূত হয়।

কায়চিকিৎসা।

সূক্ষ্মতে অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া কায়চিকিৎসারও অনেক উপদেশ আছে। চরক পাঁচ শত ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন। সূক্ষ্মত সাইত্রিশ গণে প্রায় ৭৬০টি ভেষজের গুণবর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন সূক্ষ্মতে বিবিধ লবণ, ছয় ধাতু ও বিবিধ খনিজ পদার্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্ক দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মরজগতে চিরকালই অমর

হইয়া রহিয়াছে—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমার অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্তুচিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাঁহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। * আশীর্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞানগরিমার, অতীত স্বাধীনচিন্তার নিদর্শনস্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

* আয়ুর্বেদে পুনরায় অস্তুচিকিৎসার প্রচলনকরে ১৯১২ সালে জুন মাসে গ্রন্থকার সুশ্রুতোক্ত বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ও শস্ত্র সকলের দুই সেট করিয়া নমুন। প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে একপানি পত্র লিখিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরিষদ বিশেষজ্ঞের দ্বারা গঠিত একটি শাখাসমিতি নিযুক্ত করেন। গ্রন্থকার পুনরায় এই বিষয়টি ১৯১৩ সালের দিনাজপুরের উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে “আয়ুর্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্মাণ” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। গ্রন্থকার আশা করেন যে পরিষদের শাখাসমিতির কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহাদের কাণ্য আয়ুর্বেদে অস্তুচিকিৎসার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

গেলিলিও ।

ভারতে যত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় আছে—এমন বোধ হয় আর কোনও দেশে নাই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও বিবাদ পুরাণাদি পাঠে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এককালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষে ভারতে ঘোরতর ধর্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়পীড়িত ভারতে ইউরোপের লোমহর্ষণ ধর্মবিপ্লবের সাদৃশ্য মিলিবে না। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের মধ্যে ধর্মের নামে নরকের যে দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি এখনও সভ্যসমাজকে লজ্জা দিতেছে। ধর্মের নামে, ভগবানের নামে শত শত নরনারীকে জীবন্ত অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে বিপক্ষপক্ষীয় ধর্মসম্প্রদায় বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্মের কথা দূরে থাকুক, চিরশাস্ত্রশীতল বিজ্ঞানতত্ত্বচ্ছায়াশ্রিত সুধী ব্যক্তিকেও মধ্যযুগের ইউরোপ নিপীড়িত করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্নিকাস প্রচার করিলেন যে পৃথিবী সচলা, সূর্যের উদয় ও অস্তগমন সূর্যের গতির নির্দেশক নহে, পরন্তু পৃথিবীর ভ্রমণ জন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্বে সকলের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রবিন্দু, এবং সূর্য্য

ও নক্ষত্রবর্গ পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কোপার্নিকাসের মত বাইবেলের মতের বিরোধী। পিতৃপুরুষগণের পুণ্যের বলে তাঁহাকে বিশেষ নির্গাতন ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মতাবলম্বী অনেকই মতের স্থান রক্ষা করিতে গিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো ব্রাহি দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, ক্রনোকে রোমনগরীতে ছয় বৎসর কারাবদ্ধ করার পর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জলন্ত অগ্নিতে পুড়াইয়া নারা হইয়াছিল। বিচিত্র রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকর্তা এন্টোনিও ডিনিসের কারাগারে মৃত্যু হওয়াতে জলন্ত অগ্নির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই। এই প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইবে তিনিও রোমের ধর্মব্যঙ্গগণের নিকট অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর চিরশীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের অপরাধ ছিল এই যে, ইহারা বাহ্য মত বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহাই লোকসমাজে নির্ভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। এখন বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালক পৃথিবীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা গুলিলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাইবে যে ইহা প্রচার করিতে গিয়া কাহাকেও কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে, কাহাকেও দম্নতন্ত্রের ত্রাস দেশ হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে, এমন কি কাহাকেও জলন্ত অনলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে পৃথিবীর সচলতা কোপার্নিকাসের বহুপূর্বে আর্য্যভট্টের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। উহা বেদ পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী ছিল না এমন নহে। কিন্তু ভারতের চিরউদার ধর্মভাব কখনও বিজ্ঞানের সেবককে উৎপীড়ন করে নাই। যে সকল মহাপুরুষ

বিজ্ঞানের সেবায় লাঞ্ছনার বন্ধন জয়মালা বলিয়া নতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাত্মা গেলিলিও তাঁহাদের সর্বপ্রধান। শেষবয়সে তিনি একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তাঁহার উজ্জ্বল নয়নজ্যোতি নৈশগগণের অতুল সৌন্দর্য্যের ভিতর বিশ্বজগতের কত গুঢ় রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

গেলিলিও গেলিলি (Galileo Galilei) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃপাতী পিসানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভিন্সেনজো উচ্চকুলোদ্ভূত কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; অঙ্কশাস্ত্রে ও সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার প্রবল অনুরক্তি ছিল। গেলিলিও এই দুইটি বিদ্যায় আসক্তি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই গেলিলিওর বিজ্ঞানের প্রতি আসক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বালক গেলিলিওকে এটা সেটা, ছোট ছোট খেলনা, যন্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে সর্বদাই দেখা যাইত। পুত্রের এইরূপ বিজ্ঞানাসক্তি দেখিয়া পিতা কিঞ্চিৎ ভীত হইতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের সেবা করিলে অল্পসংস্থান হওয়া বড়ই স্কন্ধি হইবে। তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপকের বাৎসরিক মাহিনা ছিল ২০০০ স্কুডি (প্রায় ৬৫০০ টাকা), আর অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকের মাহিনা মাত্র ৬০ স্কুডি বা ২১৫ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ২০ টাকারও কম। সেইজন্য তিনি গেলিলিওকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্ত স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন।

কিন্তু গেলিলিও বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র ছাড়িতে পারিলেন না। পিতার অজ্ঞাতসারে অস্টিলিও রিসি (Ostilio Ricci) নামক

একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদের নিকট ইউক্লিডের জ্যামিতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইউক্লিড শেষ করিয়া আর্কিমিডিসের গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এই সংবাদ পিতার নিকট পহুছিলে, তিনি পুত্রের বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়া অগত্যা পুত্রের মতেই মত দিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া বালক গেলিলিও অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানান্তরিক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই ঐ দুই শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। শেষে তাঁহার পিতা যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল—ছাব্বিশ বৎসর বয়সে গেলিলিও নির্দিষ্ট ২০ টাকা মাসিক বেতনে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি “বাদ্‌শার্ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”। গেলিলিও পিতার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে হয়ত কালে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবীতে অথই কি জীবনের একমাত্র উপাস্ত্র দেবতা? তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া যে অমূল্য সামগ্রী অক্ষয় কীর্তি—লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কুবেরের সমস্ত ভাণ্ডারের বিনিময়েও পাওয়া যায় না।

পেণ্ডুলামের নিয়ম আবিষ্কার ।

পঠদশাতেই গেলিলিওর মৌলিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বেই পেণ্ডুলামের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলাম সকলেই দেখিয়াছেন; এই পেণ্ডুলামের গতির উপর ঘড়ির ক্রিয়া নির্ভর

করিতেছে। গেলিলিও একদিন গির্জায় আরাধনা করিতে গিয়াছেন, গির্জার কড়িকাঠ হইতে যে বড় আলোকাধার ঝুলিতেছিল তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। আলো সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছে এবং তখনও ল্যাম্পটা ঝুলিতেছিল। গেলিলিও এক হস্তের দ্বারা অপর হস্তের নাড়ীর স্পন্দন গুণিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে ল্যাম্পটা কত সময়ে একবার দোলে তাহাও দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দেখিতে পাইলেন যে ল্যাম্পটা প্রথমে জ্বরে, ক্রমে আস্তে আস্তে ঝুলিতে লাগিল বটে, কিন্তু দেখা গেল, জ্বরেই হউক আর আস্তেই হউক ল্যাম্পটা ঠিক সমপরিমাণ সময়েই এক দিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে। নাড়ীর স্পন্দন গুণিয়া তিনি সময় নির্ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বাটী আসিয়া একগাছি দড়িতে একটা ভারী জিনিস বাধিয়া দোলাইতে লাগিলেন এবং গির্জায় যাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিলেন। এইরূপে পেণ্ডুলামের সমগতিত্ব (isochronism) আবিষ্কৃত হইলে প্রথমে উহা ঘড়ির নির্মাণকল্পে ব্যবহৃত হয় নাই, প্রথম প্রথম নাড়ীর স্পন্দনের গতি নির্ণয়কল্পে ব্যবহৃত হইত; পরে হিউজেন্স উহা ঘড়ির নির্মাণকল্পে ব্যবহার করেন।

পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম আবিষ্কার।

আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর বলুন ত। একটা দশসেরা আর একটা একসেরা ওজন লইয়া কলিকাতার রুম্মেণ্টের উপর হইতে দুইটাকে এক সময়ে ছাড়িয়া দিলাম। বলুন দেখি কোনটা কোন সময়ে নীচে পড়িবে। আপনি যদি গেলিলিওর জীবনবৃত্তান্ত পাঠ না করিয়া থাকেন তাহা

হইলে নিশ্চয়ই বলিবেন—কেন, দশসেরা ওজনটা একসেরা ওজনের দশগুণ আগে মাটিতে পড়িবে। গেলিলিওর আগে লোকে এইরূপই জানিত। বিখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টটলও (Aristotle) দশসেরা ওজন একসেরা ওজনের অপেক্ষা দশগুণ ভারী বলিয়া দশগুণ শীঘ্র মাটিতে পড়িবে তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। এরিস্টটল অবশ্য পরীক্ষা করিয়া একথা লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তিনি যখন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন তাহা অদ্রাস্ত বৈদবাক্য। গেলিলিও বলিলেন—না, তা হইতে পারে না; দুইটা ওজনই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহার মতের জন্ত তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে উপহাস করিতে ক্রটি করিলেন না। একদিবস তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাবতীয় অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া পিসার* সুবিখ্যাত “লিনিং টাওয়ারে” (Leaning tower) উপস্থিত হইলেন। এই বৃহৎ স্তম্ভটি আটতাল্লা উচ্চ ও একদিকে হেলিয়া আছে। তিনি একটি পঞ্চাশ সের আর একটি আশ সের ওজনের গোলা লইয়া এই স্তম্ভের উপরে উঠিলেন এবং উপরে গিয়া একই সময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল যে গেলিলিও এই ব্যাপারে হাঙ্গাম্পদ হইয়া যাইবেন; কিন্তু যখন সকলে দেখিতে পাইলেন যে গোলা দুইটি একসঙ্গে ধমাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল তখন তাঁহারা নিজেরাই বোকা বনিয়া গেলেন। তাঁহার সম্প্রদায়বালোকে ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখিয়াও গেলিলিওর কথার বিশ্বাস করিলেন না; নানারূপ বাক্যজালে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিতে লাগিলেন। অন্ধবিশ্বাস ও স্তব্ধতার হ্রাসই

অচল ; জ্ঞানের খরশ্রোতে না পড়িলে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া বড়ই দুষ্কর। একথা যেমন সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধে সত্য, বিজ্ঞানসম্বন্ধেও যে অসত্য তাহা নহে।

দশ সের ও এক সের ওজনের দ্রব্য একসঙ্গে কেন মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহা অতি সহজে পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। মনে করুন আপনি এক সের ওজনের এগারটি বল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই এগারটি বলকে একসঙ্গে একজায়গা হঠাতে ফেলিয়া দিলেন। অবশ্য সকলগুলিই একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তাহার পর উহাদের দশটি একসঙ্গে জুড়িয়া দিলেন এবং এই জোড়া বল ও বাকি বলটিকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দিলে উহারা একসঙ্গে পড়িবে না কেন? যে দশটি বলকে একসঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে এখন জোড়া হইয়াছে বলিয়া কি দশগুণ আগে পড়িবে? কখনই না। সেইরূপ একখণ্ড কাগজ ও একটা টাকা একসঙ্গে মাটিতে পড়িবে। তবে এক্ষেত্রে বাতাসের দরুণ কাগজখণ্ড বাতাসে উড়িতে থাকিবে। যদি বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রে (air pump) বায়ুকে নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে টাকাটি ও কাগজের টুকরা ঠিক একই সঙ্গে পড়িয়া যাইবে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্র এই পরীক্ষাটি কলেজে দেখিয়া থাকেন।

গেলিলিও পিসায় অবস্থানকালে পতনশীল দ্রব্যের (falling bodies) পতন সম্বন্ধে আরও অনেক গবেষণা করিতে লাগিলেন—কলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু যতই তিনি নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, তাঁহার শত্রুবর্গ তাঁহার উপর ততই খড়গহস্ত হইতে লাগিলেন। তিনি তিন

বৎসরের জন্ম অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বৎসর শেষ হইতে না হইতে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, সংসারে একটি ভ্রাতা ও তিনটি ভগিনী। তাঁহাদের আর্থিক অধস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যবশতঃ ভেনিসের মন্ত্রণাসভা তাঁহার সুনাম শুনিয়া ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তিনি আঠার বৎসরকাল কর্ম করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তিনি দূরবীক্ষণযন্ত্র (telescope) আবিষ্কার করিয়া তাঁহার সাক্ষ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার।

গেলিলিও পড়িয়াতে মাত্র দুই বৎসর অধ্যাপকতা করিয়াছেন এমন সময়ে বিজ্ঞানজগতে একটি লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়া গেল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে কোপার্নিকাস প্রচার করিলেন—পৃথিবী সচলা ও সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্তী জ্যোতিষীগণ এবং নাইবেল উপদেশ দিয়াছেন যে পৃথিবীই এই জগতের কেন্দ্রস্থল। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। কোপার্নিকাস তাঁহার প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অল্পকাল মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন, নচেৎ এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশের প্রতিকূল মতের আবিষ্কর্তাকে নিশ্চয়ই নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। তাঁহার মৃত্যুর পর বিখ্যাত জ্যোতিষী টাইকো ব্রাহী তাঁহার মতের পোষকতা

করিতে গিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। টাইকো ব্রাহী, কেপলার ও গেলিলিওর সমসাময়িক গিওর্ডানো ব্রুনো (Giordano Bruno) নামক একজন তেজস্বী ইতালীবাসী সর্বসমক্ষে কোপার্নিকাসের মত প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন, ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি বাইবেলের বিরোধী মত প্রচার করিতে নিমিত্ত হইলেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে বাইবেল মানুষকে ভগবানকে ভালবাসিতে ও পবিত্রজীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে, বিজ্ঞানের রহস্য নির্ধারণকরে রচিত হয় নাই।

রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানধর্মের প্রধান পুরোহিত হইতেছেন রোমের পোপ। তখনকার দিনে ধর্মদেবীদের বিচারের জন্য “ইনকুইজিশন” (Inquisition) নামক এক বিচারালয় ছিল। এখানকার বিচারকগণ উচ্চপদস্থ ধর্মপ্রচারক ছিলেন। এই বিচারালয়ে ধর্মদেবী ব্রুনোর বিচার হয়। বিচারের ফলে তাঁহাকে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ করা হয়। তখনও নির্ভীক চিত্তে নিজের মতের পোষকতা করাতে তাঁহাকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়।

গেলিলিও যৌবনকাল হইতে কোপার্নিকাসের মতের পরিপোষক ছিলেন। সেইজন্য ব্রুনোর এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে তিনি নিজে যে বিচলিত হন নাই এমন বোধ হয় না। গেলিলিও বহুদিবস যাবৎ কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করিবার জন্য নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী কেপ্লারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, “আমি

প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি সংগৃহীত করিয়াছি, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি না ; কারণ আমার ভয় হয় যে তাহা হইলে আমাদের গুরু কোপার্নিকাসের দশাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদিও তিনি কয়েকজনের নিকট অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ নির্দোষ ব্যক্তির নিকটই উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া 'রহিয়াছেন।’

কোপার্নিকাসের মত কেবল বাইবেলের মতের বিরোধী বলিয়া সকলের নিকট উপহাস ও ঘৃণার সামগ্রী হইয়াছিল তাহা নহে। তাহার প্রধান কারণ মানব চরিত্রের এক প্রধান গুণ রহস্য। কোপার্নিকাসের শত শত বৎসর পূর্বে হইতে এরিস্টটল, টলেমে, হিপার্কাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার বিপরীত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঋষিস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁহাদের মতের ভ্রান্তি কল্পনা করাও মহাপাপের কার্য। কোপার্নিকাসের ও গেলিলিওর সমসাময়িক পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে বিজ্ঞানের লোকবিচার করিবার অবসর নাই। অনেকে বলিয়াছেন বলিয়া সত্য সত্য নহে, সত্য সত্য বলিয়াই সত্য। বাগভটের উক্তি—

ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্দ্রক্লুঃ চরকসুশ্রুতো।

ভেড়াগাঃ কিং ন পঠ্যন্তে তস্মাদ্ গ্রাহং সূভাষিতম্ ॥

তাঁহাদের জানা থাকিলে এত অনর্থ ও রক্তপাত হইত না। “তস্মাৎ গ্রাহং সূভাষিতম্”—যাহা সূভাষিত তাহাই গ্রাহ। স্বাধীন চিন্তা, বিকাশ, বিস্তৃতি, বিজ্ঞানের প্রাণ। যদি পুরাতন ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে উহাকে বিজ্ঞান সমূলে

উৎপাটিত করিবেই করিবে, উহার জন্মদাতা অমুক বলিয়া তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। বিজ্ঞান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার সেবকেরা সত্যের মহিমায় দীপ্ত হইয়া পৃথিবীর অত্যাচারকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই কোপার্নিকাস, টাইকো, ব্রেনো, কেপ্লার, গেলিলিও লোকলজ্জা ও উপহাসকে ভয় না করিয়া অকুতোভয়ে বিজ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কোপার্নিকাসের পর কত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত অভিজ্ঞতা পৃথিবী অর্জন করিয়াছে, এখনও কি এত প্রাচীনের প্রতি অহেতুকী ভক্তি গিয়াছে? সেদিন যখন চার্লস ডারউইন মানবের ক্রমবিবর্তনের সংবাদ প্রচার করেন তখনও তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মদ্বেষী বলিতে অনেকে বিরত হন নাই। আনাদের দেশেও কত অসত্য প্রাচীনত্বের দাবী করিয়া অবোধে চলিয়া যাইতেছে। যদি কেহ বলেন যে, “স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ” সোণার পাথরবাটার মত একটি অবাস্তব পদার্থ, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি “তাণ্ডবনৃত্য” বলিয়া পরিচিত করিবার লোকের অভাব নাই। প্রাচীনের প্রতি সম্মান করিব, কিন্তু উহা প্রাচীন বলিয়াই অদ্রাস্ত, একথা স্বীকার করিয়া লইব না— এই শিক্ষা আমরা কোপার্নিকাস ও গেলিলিওর জীবনচরিত হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোপার্নিকাসের মতের পোষকতা করিবার জন্ত গেলিলিও প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। এতদিন কোপার্নিকাসের মত অনেকটা অল্পমানের উপর নির্ভর করিতেছিল। গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহার চাক্ষুস প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরবীক্ষণের আবিষ্কার

একটু বিচিত্র। হলাণ্ড দেশে জ্যান্সেন ও লিপার্সে নামক দুই-জন চশমাবিক্রেতা বাস করিত। প্রবাদ এই যে জ্যান্সেনের ছেলেপিলেরা এক দিবস দুইখানা আতসী কাচ লইয়া খেলা করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, কাচ দুইখানা এক ভাবে ধরিলে সন্মুখের গির্জার চূড়াটা খুব নিকটস্থ ও উল্টা দেখা যায়। তাহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের পিতাকে সংবাদ দিল। এই সংবাদ পাইয়া জ্যান্সেন ও লিপার্সে কাচ দুইখানি একখানি কাষ্ঠে বসাইয়া চশমার দোকানে নূতন খেলানা বলিয়া রাখিয়া দিল। একদিন মাকু'ইস স্পিনোলা নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দোকানে গিয়া খেলানাটি ক্রয় করিয়া আনিয়া যুবরাজ মরিসকে দেখাইলেন। যাহা হউক এই চশমাবিক্রেতাদের খেলানার সংবাদ অস্পষ্টাকারে গেলিলিওর নিকট পৌঁছিয়াছিল। গেলিলিও এই সংবাদে এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সমস্ত রাত্রি তিনি এই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। প্রাতে উঠিয়া আতসী কাচ লইয়া পরীক্ষায় বাস্তব হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া ঠিক করিয়াছিলেন যে যখন এই খেলানায় দূরের গির্জার চূড়া নিকটে দেখায়, তখন বহুদূরস্থিত আকাশের নক্ষত্রাবলী কি এই যন্ত্রের সাহায্যে নিকটস্থ দেখাইবে না? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আকাশমার্গের কত গুটু রহস্যই না প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কত অজানিত জগৎ সন্মুখে দেখা যাইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহনক্ষত্রের কত নূতন অদ্ভুত সংবাদই না সংগৃহীত হইবে। এইরূপ ধারণা তাঁহাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া ফেলিল। তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার নিকট অর্গান বাজাইবার একটা নল ছিল, অনেক চেষ্টার পর নলের একমুখে একখানি উন্নতদর (convex) লেন্স ও আর

এক মুখে একখানি নতোদর (concave) লেন্স বসাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া সোৎসুকনেত্রে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাঁহার যন্তে দূরের জিনিস খুব নিকটস্থ ও তিনগুণ বৃহৎ দেখাইতে লাগিল। উপরন্তু চশমা বিক্রেতার খেলানার দ্বারা ইচ্ছাতে পদার্থ সকল উল্টা না দেখাইয়া সবই সোজা দেখাইতেছিল। তখন তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। বাস্তবিক কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করার পর মনে কত আনন্দের উদয় হয়, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ তাহা অনুভব করিতে পারে না। অনেক সময়ে অনেককে হাসিতে নাচিতে, এমন কি আনন্দে ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থ হইতে শুনা যায়। আর্কিমিডিসের বিষয় কথিত আছে যে তিনি স্নানাগারে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা কল্পিত বিষয়ের মীমাংসা মনে উদয় হওয়াতে তিনি এমনই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া “আমি পাইয়াছি! আমি পাইয়াছি!” এই বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া বাটী পহুঁছিয়াছিলেন।

গোললিও এই অদ্ভুত যন্ত্র লইয়া তাড়াতাড়ি ভেনিস নগরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া আশ্চর্যান্বিত করিতে লাগিলেন। প্রবীণ বুদ্ধেরা পর্যাস্ত যষ্টিতে ভর করিয়া উচ্চস্থানে উঠিয়া এই যন্ত্রের ভিতর দিয়া সুদূরস্থ জাহাজ সকল নিকটস্থ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে তাঁহার নাম ব্যক্ত হইয়া পড়িল। “বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে”—কিবা রাজদ্বারে, কিবা রাজবস্ত্রে সর্বত্রই তিনি পূজা পাইলেন। কর্তৃপক্ষেরা তাঁহার মাহিনা

দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার অধ্যাপকতা আজীবনস্থায়ী করিয়া দিলেন।

তাহার পর তিনি যাহাতে উহা অপেক্ষা কার্য্যাকরী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা করিতে, লাগিলেন, নিজেই লেন্স বসিয়া স্বহস্তে আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। এই যন্ত্রের দ্বারা এখন তিনি রাত্রির পর রাত্রি বিনিন্দ্র অবস্থায় স্থূল অক্ষরের সৌন্দর্য্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রই গেলিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রিয়া অবগত আছেন। সাধারণ পাঠককে ছুই এক কথায় মোটামুটি অনেকটা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। সাধারণ আতসী কাচ সকলেই দেখিয়াছেন— তাহা উন্নতোদর লেন্স। যদি আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সংযত করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের একটি ছোট গোল সাদা ছবি অপর দিকে পড়িয়া থাকে। উহা উন্টা। এই নিকটস্থ উন্টা ছবি আর একখানি উন্নতোদর লেন্সের ভিতর দিয়া দেখিলে উন্টা এবং বড় দেখায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একখানি উন্নতোদর ও একখানি নতোদর লেন্স ব্যবহৃত হওয়াতে সোজা ছবি পাওয়া গিয়াছিল। চশমাযন্ত্রে তাহা উন্টা হইয়াছিল। আজ যে সকল বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রমশীল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর, অনন্ত সৌরজগতের, স্থিতিস্থিতিয়সম্বন্ধে অপ্রাপ্তপূর্ব্ব অচিস্তনীয় সংবাদ মানবের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসিতেছে, সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশ যে রত্নপ্রসূ তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

চন্দ্র

স্বভাবতই গেলিলিও চন্দ্রের প্রতি তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র
প্রথম ফিরাইলেন। হায় কবি! তুমিই বিজ্ঞানের প্রধান শত্রু।
তুমি চন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া রমণীর সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা



গেলিলিও

দিয়া থাক, তাহাতে আপত্তি করিব না (যদিও পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় নিটোল, চাকা থালার ত্রায় সুগোল, থ্যাভ্‌ডানো বদন কয়জন পাঠক পছন্দ করিবেন তাহা আমি জানিতে চাহি); কিন্তু তুমি কবি, নেশার ঝোঁকে চন্দ্রের মধ্যস্থিত পর্বত উপত্যকাকে শর্শীর কলঙ্ক, বুড়ির চরকা প্রভৃতি আজগুবি ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানের পথ একেবারে রোধ করিয়াছ। তুমি বিচিত্র রাম-ধনুসক' বাসবের বা রামের ব্যবহৃত ধনু বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছ। তুমি নক্ষত্রবর্গকে সুরসুন্দরী সাজাইয়া চন্দ্রকে বোহিণী প্রভৃতি সাতাইশ সুন্দরীর বহুপত্নীক স্বামী গড়িয়াছ। তোমারই বাক্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অত্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া অবাধে গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। এ ঘটনা শুধু ভারতেই ঘটয়াছে তাহা নহে। সমগ্র আদিম মানবসমাজে এইরূপ কল্পনার অভাব দৃষ্ট হয় না। তাই যখন গেলিলিও তাঁহার যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলেন যে পৃথিবীর ত্রায় চন্দ্রও পর্বত, উপত্যকা, সমতলক্ষেত্র প্রভৃতি দ্রব্য বিত্তমান রহিয়াছে তখন সে সংবাদ কেহই বিশ্বাস করিল না। তাহাও কি কখন হয়? ঐ স্বর্গীয়, শান্তশীতল, সুধাময় চন্দ্রবদন কখনও কি পাহাড় পর্বতে পরিপূর্ণ হইতে পারে? তিনি আবার এই সকল পাহাড়ের উচ্চতাও মাপিয়াছিলেন—কোনও পর্বত পাঁচ মাইল, কোনটি বা সাত মাইল উচ্চ। তাঁহার অপরাধের সংখ্যা এখনও শেষ হয় নাই—তিনি প্রচার করিলেন যে যেমন চন্দ্র সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া কিরণ বিতরণ করে, সেইরূপ পৃথিবীও কিরণ বিতরণ করিয়া থাকে। সকলেই তৃতীয়া চতুর্থীর চাঁদে দেখিয়া থাকিবেন যে, কাস্তুর মত চাঁদের উজ্জ্বল ফলার সঙ্গে চাঁদের

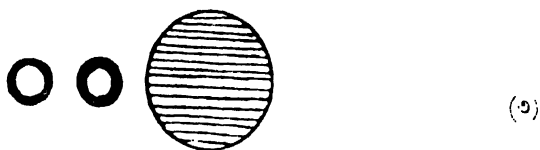
অপর অংশ অস্পষ্ট দেখা যায়। গেলিলিও বলিলেন এরূপ দেখা যাইবার কারণ আর কিছুই নহে—পৃথিবীর কিরণ চাঁদে পড়িয়া চাঁদে “পৃথিবীজ্যোৎস্নার” উদয় হইয়া থাকে। আমরা যেমন পৃথিবী হইতে চাঁদ দেখি, চাঁদে যদি কোনও জীব থাকিত তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ আলোকময় পৃথিবী দেখিত। কেবল পৃথিবী তাহাদের কাছে চন্দ্র অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল ও প্রায় যোলগুণ বড় দেখাইত।

গেলিলিওর এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের সংবাদ তাৎকালিক পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কাটা ঘায়ে স্নানের ছিটার মত পড়িল। জ্ঞানের বৃদ্ধির প্রয়োজন কি—যদি চন্দ্রকে এইরূপে স্বর্গের দেবতার আসন হইতে পদচ্যুত হইতে হয়! কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধবাদীরা বলিতেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ হইতে পারে না, কারণ অগ্ন্যন্ত্র গ্রহের স্থায় উহার কিরণ নাই। গেলিলিও “পৃথিবীকিরণ” আবিষ্কার করাতে তাঁহাদের আর একটি অবলম্বন থসিয়া পড়িল।

গেলিলিও তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র এখন নভোমণ্ডলের চতুর্দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। চতুর্দিকেই নূতন নূতন তারকা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। সূনীল নভোমণ্ডলের মেঘলাস্বরূপ “ছায়াপথ”—বাহ্য কবিকল্পনায় দেবতাদিগের স্বর্গের রাজ্যবস্তু বলিয়া কল্পিত হইয়া আসিয়াছে—গেলিলিওর যন্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকার সমষ্টি বলিয়া ধরা পড়িল। কোন কোনও তারকা চন্দ্রচক্ষে একটি বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে দুইটি তারকা দেখিতে পাইলেন।

বৃহস্পতির উপগ্রহ ।

১৬১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter) খুব মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৭ই জানুয়ারী তিনি উহার নিকটে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকা



বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার ।

দেখিতে পাইলেন । উহার মতো দুইটি তারকা বৃহস্পতির বাদে ও অপরটি দক্ষিণে ছিল । পর রাত্রে দেখিতে পাইলেন যে

(১) ৭ই জানুয়ারী ১৬১০ ।

(২) ৮ই জানুয়ারী ১৬১০ ।

(৩) ৯ই জানুয়ারী ১৬১০ ।

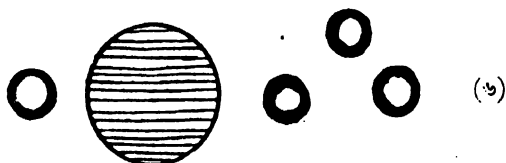
তিনটি তারকাই উহার দক্ষিণে আসিয়াছে। ৯ই তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সে রাত্রে আর কিছুই দেখা গেল না। ১০ই তারিখে গেলিলিও দেখিলেন যে সে রাত্রে দুইটি



(৪)



(৫)



(৬)

বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার।

তারকা ফুটিয়াছে, দুইটিই গ্রহের বাম দিকে। ১১ই তারিখেও সেই দুইটি তারকা বৃহস্পতির বামেই আছে, তবে একটি একটু বড় দেখাইতেছিল। ১২ই তারিখে তিনটিই আবার ফিরিয়া

(৪) ১১ই জানুয়ারী ১৬১০।

(৫) ১২ই জানুয়ারী ১৬১০।

(৬) ১৩ই জানুয়ারী ১৬১০।

আসিয়াছে এবং ৭ই জানুয়ারীর মত দুইটি বামে ও একটি ডাহিনে আসিয়াছে। তাহার পর দিবস গেলিলিও ঐরূপ চারিটি তারকা দেখিতে পাইলেন। ঐরূপ চারিটির বেশী তারকা আর দেখা গেল না। গেলিলিও এখন প্রচার করিলেন যে যেমন পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিদিকে চারিটি উপগ্রহ বা চন্দ্র ঘুরিতেছে। পৃথিবী যেমন একটি গ্রহ এবং উহার উপগ্রহ আছে, সেইরূপ বৃহস্পতিও আর একটি গ্রহ এবং উহার উপগ্রহ আছে। এই পরীক্ষামূলক তথ্যের সংবাদ রাষ্ট্র হইলে তাৎকালিক বিজ্ঞপুরুষগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাও কি কখন হয়?—অনেকেই অবিশ্বাস করিলেন। এ সংবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে বাইবেলকে অশাস্ত করিতে হয়, প্রচলিত প্রাচীন মতকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। পৃথিবীই যে জগতের মূলধার,--কেমন করিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর ঋণ্য অন্ততঃ আর একটি গ্রহ বর্তমান আছে।

গেলিলিও সকলকে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত উপগ্রহগণের ভ্রমণ পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিলেন। কেহ কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াও বলিলেন যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পৃথিবীর দ্রব্যসমূহ সঠিকরূপে দৃষ্ট হইলেও উহা আকাশমार्গের রহস্তভেদ করিতে সনর্থ নহে। অপর কেহ কেহ অবিশ্বাসী হইবার ভয়ে যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে স্বীকৃত হইলেন না। ঐরূপ এক ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়। গেলিলিও রহস্তচ্ছলে বলিয়াছিলেন, “আমি আশা করি তিনি স্বর্গে যাইবার পথে ঐগুলি দেখিয়া গিয়াছেন।”

শুক্রে গ্রহের ক্ষয়বৃদ্ধি।

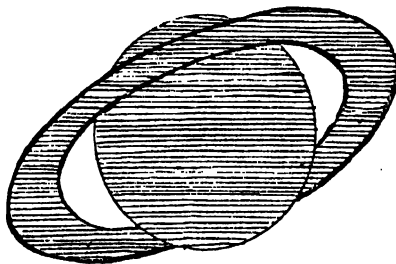
এই সকল অশ্রুতপূর্ব আবিষ্কারের পর গেলিলিওর মনে এই সুন্দর অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থিতি ও গতির রহস্য উৎঘাটন করিবার বাসনা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। চতুর্দিকের অবিশ্বাস তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে সমর্থ হইল না। পরন্তু তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও মানসিক বল তাঁহাকে তাঁহার আরও কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্ত সন্ধিক প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্রই আর একটি পরীক্ষামূলক আবিষ্কারের দ্বারা তাঁহার শত্রুবর্গের আশা ভরসা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তিনি শুক্রগ্রহ (Venus) পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উহা গোলাকার। একরাত্রে তিনি সন্ধ্যায় দেখিতে পাইলেন যে উহা তৃতীয়া বা চতুর্থীর চাঁদের সরু ফলার আয় দেখা যাইতেছে। তাহার পর তিনি রাত্রির পর রাত্রি শুক্রগ্রহের পরিবর্তন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—ক্রমে ক্রমে উহা ফলকের আকৃতি হইতে স্নগোল পূর্ণচন্দ্রের আয় পুরিয়া উঠিল। তখন তাঁহার আর আনন্দ ধরে না। ইহা হইতে অবিসম্বাদীরূপে সপ্রমাণিত হইতেছে যে শুক্রগ্রহও পৃথিবীর সহিত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

। কোপার্নিকাস পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে মানবের দৃষ্টিশক্তি যদি সম্যক বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ চন্দ্রের আয় ক্ষয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে। গেলিলিও এই ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা এই নূতন প্রমাণের উপরে বিশ্বাস স্থাপনত

করিলেনই না, উপরন্তু গেলিলিওর উপর তাঁহাদের আক্রোশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন যে যদি গেলিলিওর মত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যে একটা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বহুকাল হইতে তাঁহারা শিথিয়া আসিতেছেন যে, পৃথিবীই জগতের কেন্দ্রস্থল, এই অগণ্য তারকামণ্ডলী রাত্রিতে পৃথিবীকে আলোক প্রদান করিবার জন্তই সৃজিত হইয়াছে। এত বড় মতের পরির্তন কি সহজে হয় ?

শনিবলয় (Saturn's ring) ।

তাহার পর গেলিলিও শনিগ্রহের দিকে তাঁহার যন্ত্র ফিরাটলেন। তিনি শীঘ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে এই গ্রহ একটি মাত্র তারকা নহে, উহার দুই পাশে আরও দুইটি ছোট ছোট তারকা আছে। পরে জানা গিয়াছে যে এই দুইটি পদার্থ

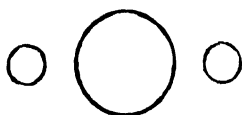


শনি বলয়

তারকা নহে, উহারা এই গ্রহের চারিদিকে যে গোলাকার বলয় (ring) আছে, তাহারই দুই প্রান্তভাগ মাত্র। গেলিলিওর

দূরবীণ যন্ত্র সমধিক উৎকৃষ্ট না হওয়াতে সমগ্র শনিবলয় গেলিলিওর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হিউজেঞ্চ বৃহত্তর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ শনিবলয় আবিষ্কার করেন।

এই সমস্ত অশ্রুতপূর্ব অচিন্তনীয় আবিষ্কার গেলিলিও প্রায় এক বৎসরের মধ্যে করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের



গেলিলিও কর্তৃক দৃষ্ট শনিবলয়।

মধ্যে পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের কিরূপ দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত আবিষ্কারকাণ্ডিনী হইতে সম্যক উপলব্ধি হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাস সত্ত্বেও বহু ছাত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইউরোপে সর্বত্র তাঁহার আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইতে লাগিল এবং বিভিন্ন দেশের জ্যোতিষী-বর্গ গেলিলিওর তাবৎ আবিষ্কার নিজ নিজ পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিতে লাগিলেন। প্রবল বক্তার স্রোত কি বালির বাধে রোধ করা যায়?

সূর্য্য কলঙ্ক (Sun-spots)।

তাঁহার পর বৎসর ১৬১১ খৃষ্টাব্দে গেলিলিও সূর্য্যের দিকে তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ফিরাইলেন। হায়! হায়! গেলিলিও করিলে কি? যে সূর্য্য কবিকল্পনায় দেবতার আসনে উপবিষ্ট,

যিনি সপ্তাশ্চর্য্যরূপে আরোহণ করিয়া প্রভাতকালে পূর্বদিকে উদিত হইয়া প্রবল প্রতাপে রথনেত্রির গম্ভীর নির্ঘোষে, নভো-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বিচরণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন, ঐহার পূজা, হোম, তপ অতি প্রাচীন যুগ হইতে এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত, তাঁহারই প্রতি তুমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তোমার বস্ত্র ফিরাইতে সাহসী হইলে? তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমায় যদি একেবারে হত্যা করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের নিতান্ত দম্মার শরীর বলিয়া আমরা তাঁহাদের প্রশংসাই করিব। গেলিলিও পরীক্ষা করিতে করিতে সূর্য্যের মধ্যে কতকগুলি দাগ বা কলঙ্ক (Sun-spots) দেখিতে পাইলেন। এই দাগগুলি সকল সময়ে একরূপ থাকে না, কখনও কখনও কতকগুলি মিলিয়া এক হইয়া যায়, কখনও কখনও একটাই ভাঙ্গিয়া অনেকগুলিতে পরিণত হয়। গেলিলিও কেবল এই দাগগুলি আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই দাগগুলি ক্রমে ক্রমে মিশাইয়া গিয়া পুনরায় আটাইশ দিবস পরে আবার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা তিনি সহজেই সপ্রমাণ করিলেন যে, আটাইশ দিনে সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসে।

গেলিলিওর বিচার।

এতক্ষণ আমরা গেলিলিওর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। এখন হইতে তাঁহার দুঃখপূর্ণ জীবনকাহিনীর পরিচয় দিয়া অশ্রুজলের

সহিত তাঁহার পূণ্যময় স্মৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আঠার বৎসর কাল তিনি পড়িয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐখানেই তিনি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, চন্দ্রমণ্ডলে পর্বতের অবস্থিতি ও বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সকল গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ্ক ও মন অহোরাত্র এত ব্যস্ত থাকিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনবরত ছাত্রদিগের বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার নিকট বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল। এখন তিনি বিজ্ঞানের সেবায় সমস্ত সময় কিরূপে অতিবাহিত করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহারই শিষ্য ও বন্ধু টস্কানীর গ্র্যাণ্ডিউক দ্বিতীয় কসমো (Cosmo II) তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী ফ্লোরেন্সে যাইবার জন্ত আহ্বান করিলেন। গেলিলিওর জন্মস্থান পিসানগরী ফ্লোরেন্সের অতি সন্নিকট এবং টস্কানীর অন্তর্গত; সুতরাং এই নিমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফ্লোরেন্সে প্রত্যাগমন তাঁহার পক্ষে যতই সুবিধাজনক হউক না কেন, পড়িয়া নগরী পরিত্যাগ তাঁহার জীবনের প্রধান ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল, কারণ টস্কানী রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের একচ্ছত্র রাজা পোপের ক্ষমতার অধীন ছিল। অপর দিকে ভেনিস রাজ্য প্রজাতন্ত্রের দ্বারা শাসিত এবং পোপের ক্ষমতার বিরোধী ছিল। পড়িয়া নগরী এই ভেনিস রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় তিনি মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত পোপের রোষাঘ্নি হইতে নিরাপদ ছিলেন। পড়িয়া পরিত্যাগের পর হইতেই তিনি পোপের ক্ষমতার অধীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব কতই উপরোধ অনুরোধ করিলেন,

কিন্তু কিছুতেই তিনি পছন্দ্যে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না।

“নিয়ত কেন বাধ্যতে” ?

প্রথম প্রথম ফ্লোরেন্সে গিয়া গেলিলিও বেশ শান্তিতেই ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, রাজদ্বারে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না; আর্থিক সম্বলতাও বেশ ছিল। এখানে ছাত্রদিগের জ্ঞান আর বক্তৃতা করিতে হইত না—তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন।

কিন্তু এই শান্তি প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার প্রকৃতির শান্ত্যভাবের মতই হইল। ক্রমশঃ তাঁহার বিরোধীগণ তাঁহার মতের প্রতি পোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখন গেলিলিওত আর পছন্দ্যে নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণাদি রোন হইতে ফ্লোরেন্সে অনায়াসে আসিতে আরম্ভ করিল। তিনি যে স্বীয় মতের পোষকতা করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, এ কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল। অবশেষে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল তাঁহাকে রোমনগরীতে গিয়া স্বয়ং তাঁহার মতাবলী পোপের গোচর করিবার জ্ঞান আদেশ করিলেন। তিনি রোমে বাইবার জ্ঞান প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রাদিও সঙ্গে করিয়া লইলেন। রোমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যন্ত্রাদি সাহায্যে সকলকে স্বকীয় আবিষ্কৃত গ্রহ উপগ্রহাদি প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। এক দিবস স্বয়ং পোপের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ কথাবার্তা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আবিষ্কারগুলি বুঝাইয়া দিলেন। পোপ তাঁহার উপর কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। গেলিলিও মনে করিলেন

যে তাঁহার সোভাগ্যবি এইবার মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছে । তিনি আরও কিছুকাল রোমে থাকিয়া সকলকে নিজের মত বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ইহাতে তাঁহার বিপক্ষপক্ষীয় অনেক উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক ক্রমশঃ তাঁহার উপর খজাহস্ত হইয়া উঠিলেন । এখন তাঁহার কোপার্নিকাসের মত বাইবেলবিরোধী কিনা এই মূল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পোপকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । গেলিলিও এই প্রশ্নের মীমাংসার অপেক্ষায় রোমে বিলম্ব করিতে লাগিলেন । তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহার অবস্থিতি ইহাদের কাছে অতি তিক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল । তিনি স্বকীয় নূতন মতের দ্বারা এরূপ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কোন পথ তাঁহার পক্ষে শ্রেয় তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না । অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে কোপার্নিকাসের মত বাইবেলবিরোধী । কোপার্নিকাসের এবং কেপ্‌লারের গ্রহের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রচারিত হইল । গেলিলিওর প্রতি আদেশ হইল যে তিনি আর কখনও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিবেন না । গেলিলিও ভয়ঙ্করদয়ে ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিলেন । তিনি আদৌ ধর্মদ্বৈত ছিলেন না, এবং তাঁহার মত বাইবেলের কোনও এক অংশের বিপরীত বলিয়া নিজে ভুখিতও ছিলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেন তাহা পরিত্যাগ করেন কি করিয়া ?

সে যাহা হউক গেলিলিও রোম হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকটা নিরুপদ্রবে কাল কাটাইতেছিলেন । ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে পুরাতন পোপ স্বর্গারোহণ করেন এবং কার্ডিনাল বারবেরিনো

নামক তাঁহারই একজন বন্ধু সপ্তম আর্কান নামে পোপপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বন্ধু বারবেরিনোকে পোপপদে অভিষিক্ত দেখিয়া গেলিলিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তিনি এমনও আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে পুরাতন পোপের আদেশ প্রত্যাহত হইবে। তিনি স্বীয় বন্ধুর পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ত স্বয়ং রোমনগরীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নূতন পোপের সহিত কথাবার্তায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে নূতন পোপের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া তিনি “টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ সম্বন্ধে কথাবার্তা” নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই পুস্তকে তিনি তিনজনের কথাবার্তাচ্ছলে তাঁহার মতগুলি বেশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি কোপার্নিকাসের মতাবলম্বী, দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন বিদূষক এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার একজন বিরুদ্ধবাদী। এই গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত আপত্তিই তিনি খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তক তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের গুপ্ত রোযাঘি একেবারে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। তাঁহার বিরুদ্ধে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রত্যাহত হয় নাই, অথচ তিনি স্বকীয় মত পুনরায় নূতন ভাবে প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছেন। এবার তাঁহার আর নিস্তার রহিল না। তাঁহাকে রোমে যাইয়া বিচার গ্রহণ করিবার জন্ত আদেশ প্রেরিত হইল। তাঁহার বয়স তখন সত্তর হইয়াছিল। এই সপ্ততিপর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিককে অব্যাহতি দিবার জন্ত তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ফলে কিছুই হইল

না। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোমে পৌঁছছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তিনি বাটীর বাহির হইতে নিষিদ্ধ হইলেন। জুন মাসে ইনকুইজিশন নামক বিচারালয়ে তাহার রীতিমত বিচার আরম্ভ হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মদ্বৈষীগণের জন্ত যে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাই ইনকুইজিশন নামে অভিহিত হইত।

এখানকার বিচারপদ্ধতি স্থূলতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম। অপরাধীকে বিচারালয়ে তাহার অপরাধ জ্ঞাত করান ও সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বীকৃত না হইলে তাহাকে নির্যাতনের (torture) ভয় প্রদর্শন করা।

দ্বিতীয়। নির্যাতন করিবার ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত অপরাধীকে লইয়া গিয়া পুনরায় নির্যাতনের ভয় প্রদর্শন করা।

তৃতীয়। ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া নির্যাতনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রদর্শন করা।

চতুর্থ। যন্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিয়া অপরাধীকে নির্যাতন যন্ত্রে বদ্ধ করা।

পঞ্চম। নির্যাতন ক্রিয়া।

এইরূপ নির্যাতন ক্রিয়ার পরেও যদি অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে ও অনুতপ্ত না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত চরম দণ্ড তাহার জন্ত বিধিবদ্ধ ছিল।

যষ্ঠ। কয়েক বৎসর কারারুদ্ধ করা।

সপ্তম। অগ্নিতে জীবন্ত অনহ্নায় পুড়াইয়া মারা।

২১এ জুন গেলিলিও এই ভয়াবহ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ২৪এ ঐ স্থান হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এই বিচারের সময় জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিত এবং অপরাধীও সমস্ত বিষয় গোপন রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। বিচারালয়ের খাতাপত্রও লোকচক্ষুর অগোচর। সেইজন্ত এই তিন দিবস গেলিলিওকে প্রকৃত নির্ঘাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল কি না তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। আশা করি বিচারকগণ এই পুণ্যশ্লোক বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধকে নির্ঘাতনের অনুজ্ঞা দিয়া নিজেদের রসনা কলঙ্কিত করেন নাই। এই সময় দারুণ চুশ্চিস্তায় তাঁহার শরীর ও মন একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, উপরন্তু তাঁহার মেহময়ী কণ্ঠা ক্রমাগত তাঁহাকে বশতা স্বীকার করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছিলেন। নানা কারণে গেলিলিও আর যত্ন সহ্য করিতে না পারিয়া বিচারকগণকে বলিলেন, “আপনারা আমায় বাহা বলিতে আজ্ঞা করিবেন আমি তাহাই বলিতে প্রস্তুত আছি।” তখন বিচার-পতিগণ তাঁহার প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রথম। গেলিলিও পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধে যে মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। যাবজ্জীবন কার্যাত না হউক অন্তত নামত কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে।

তৃতীয়। সাতটি অনুরূপস্থচক প্রার্থনাসঙ্গীত প্রতি সপ্তাহ আবৃত্তি করিতে হইবে।

দশ জন কাডিনাল নামক উচ্চ উপাধিধারী ধর্মদাজক

বিচারপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন বিচারালয়ের
 রায়েতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশিষ্ট সাত জনের
 কলঙ্কিত লেখনীর স্বাক্ষর এখনও এই দলিলের উপর দৃষ্ট হয়।
 গেলিলিও এইরূপে নিগৃহীত হইয়া বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ
 করিতে বাধ্য হইলেন “ইহা আদৌ সত্য নহে যে সূর্য্য জগতের
 কেন্দ্র স্থল এবং পৃথিবী সচলা। আমি এত দিবস এ বিষয়ে
 যাহা বিশ্বাস ও ধারণা করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অসত্য
 ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভবিষ্যতে
 মৌখিক বা লিখিত ভাষায় কখনও এই অসত্য প্রচার করিব
 না।” অনেকেই বলিবেন যে গেলিলিওর এইরূপ মিথ্যা প্রতিজ্ঞায়
 স্বীয় রসনাকে কলঙ্কিত করা আদৌ উচিত ছিল না, বরং
 ত্রনোর মত জলন্ত অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিয়া উৎপীড়িতের
 জয়মালা বরণ করিয়া লইলেই ভাল হইত। তাঁহাদিগের প্রতি
 অল্পরোধ এই যে, তাঁহারা এই হতভাগ্য বৃদ্ধের বয়স এবং
 তাৎকালিক শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া
 একটু করুণার নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর
 যাহারা ধর্ম্মের নামে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তির ভয় দেখাইয়া সত্যকে
 বলপ্রয়োগে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন তাঁহাদের স্মৃতির
 উদ্দেশ্যে যেন অভিসম্পাত প্রদান করেন।

কথিত আছে যে এই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করার অব্যবহিত
 পরেই গেলিলিও সেইখানেই একজন বন্ধুকে চুপে চুপে বলিয়াছিলেন
 “তবুও উহা (পৃথিবী) সচলা”। কিন্তু এই কিম্বদন্তী সত্য বলিয়া
 বোধ হয় না, কারণ ঐ বিচারালয়ে অপর কোনও ব্যক্তির
 প্রবেশের অধিকার ছিল না।

গেলিলিওর এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের নিকট পঠিত হইবার জন্ত প্রেরিত হইল। গেলিলিওর তাত্কাংকিক ভীষণ মানসিক অবস্থার চিত্র চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে। তাঁহার হৃদয় লজ্জায়, রোষে, ক্ষোভে, অপमानে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি রোমে কিছুকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া সীনা নামক স্থানে প্রেরিত হন। সেখান হইতে তাঁহার পল্লীভবন আরসেত্রী নামক স্থানে যাইতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এখানে তাঁহার মেহময়ী কণ্ঠা তাঁহার স্তম্ভা করিতে থাকেন। কিন্তু বিধাতা গেলিলিওকে বৃদ্ধবয়সে কণ্ঠাশোকও দিলেন। ছয় দিবস যাইতে না যাইতে মেহময়ী কণ্ঠা বৃদ্ধ পিতার বক্ষে দস্তক রাখিয়া অনন্ত নির্দায় অভিভূত হইলেন।

অপমানিত, ভগ্নহৃদয়, জরাগ্রস্ত গেলিলিওর তত্রাচ কক্ষে অনাসক্তি ছিল না। অবরুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি গতিশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়মত্রয় (Laws of motion) সূক্ষ্মপট ও সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এক হিসাবে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। যৌবনে তিনি পেণ্ডুলামের সমগতি ও পতনশীল দ্রব্যের গতিসম্বন্ধীয় নিয়ম (Laws of falling bodies) আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অধুনা গতিশীল দ্রব্যের গতির নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া তিনি গতিবিজ্ঞানের (dynamics) জন্মদান করিয়া গেলেন। যদিও এই শেষোক্ত নিয়মগুলি ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্তা নিউটনের দ্বারা সম্যকরূপে আলোচিত হওয়াতে তাঁহার নামেই প্রচলিত, কিন্তু ঐগুলি গেলিলিওর এই গ্রন্থ হইতে যে গৃহীত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অমূল্য গ্রন্থখানি গেলিলিও নিজে

প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারই কোনও ছাত্র উহা ইংলণ্ডদেশে লইয়া গিয়া লুক্কায়িতভাবে প্রকাশ করেন। গেলিলিও কেবল পরীক্ষামূলক জ্যোতিষের জন্মদাতা নহেন, তিনি গতিবিজ্ঞানেরও যে একজন প্রতিষ্ঠাতা তাত্ তাহা এই গ্রন্থ হইতে সন্ধ্যা উপলব্ধি হয়।

বিধাতা মহাপুরুষের পরীক্ষা বিপদের ভিতর দিয়াই গ্রহণ করেন। তাই দেখিতে পাই ভক্ত বালক ধ্রুবকে বিমাতার নির্যাতনের ভিতর দিয়া তিনি পরীক্ষা করিলেন, প্রহ্লাদের ভক্তি বিষপান, অগ্নিদাহন, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি বাবতীয় বিপদের মধ্যে অটুট থাকে কি না তাহাই তিনি বারবার দেখিয়া লইলেন। গেলিলিওর পরীক্ষা বুঝি এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তাই তিনি গেলিলিওর দৃষ্টিশক্তিও কাড়িয়া লইলেন। প্রথম একটি চক্ষু ফুলিয়া উঠিল, ক্রমে উহা হইতে দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। শেষে দুইটি চক্ষুই অন্ধ হইয়া গেল। এই সময় তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গগত কবি রজনীকান্তের মর্মস্পর্শী ভাষায় ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিতেন “আনায় সকল রকমে থর্ব করিছো, গর্ব করিতে চূর”।

তিনি এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, “তোমার প্রিয়বন্ধু এখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। এখন হইতে এই চরাচর বিশ্ব, ঐ অনন্ত নভোমণ্ডল—বাহার সম্বন্ধে জ্ঞান আমি আমার অশ্রুতপূর্ব আবিষ্কারের দ্বারা শতসহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছি—আমার কাছে একেবারে রুদ্ধ! ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন আমিও ইহাতে সন্তুষ্ট।” এই অন্ধ অবস্থায় তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার গুপ্তাশ্রয় করিত। ইংলণ্ডের মহাকবি মিণ্টন এই সময়ে ইটালী ভ্রমণ করিতে আসিয়া গেলিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর ছিল ; বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনিও অন্ধ হইয়া তাঁহার অমর কবিতাবলী স্বীয় কণ্ঠাগণকে লিখিতে বলিতেন, তখন নিশ্চয়ই ইটালীর এই ঋষিকল্প অন্ধ-বৈজ্ঞানিকের চিত্র তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইত ।

অবশেষে তাঁহার মুক্তির দিন আসিয়া দেখা দিল । আটাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তাঁহার অমর আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইল । গেলিলিও মৃত্যুর শীতল অঙ্কে বিশ্রামলাভ করিয়া জীবনের সকল জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন । মৃত্যুর পরেও তাঁহার বৈরীগণ তাঁহার উপর রূপাদৃষ্টি করেন নাই । প্রথমে তাঁহারা তাঁহার যথারীতি সংকার করিতে না দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহাতে অক্লান্তকাৰ্য্য হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে কোন স্মারকস্তুস্ত নিৰ্ম্মাণের যোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । এই অদূরদর্শী মূৰ্খেরা বুঝিতে পারে নাই যে তিনি স্বহস্তেই তাঁহার অশ্রুতপূৰ্ব্ব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা এমন অতুলনীয় অনিন্দ্যসুন্দর স্মারকস্তুস্ত রচিয়া গিয়াছেন যে তাহার জ্যোতিতে চিরদিনই দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে ।

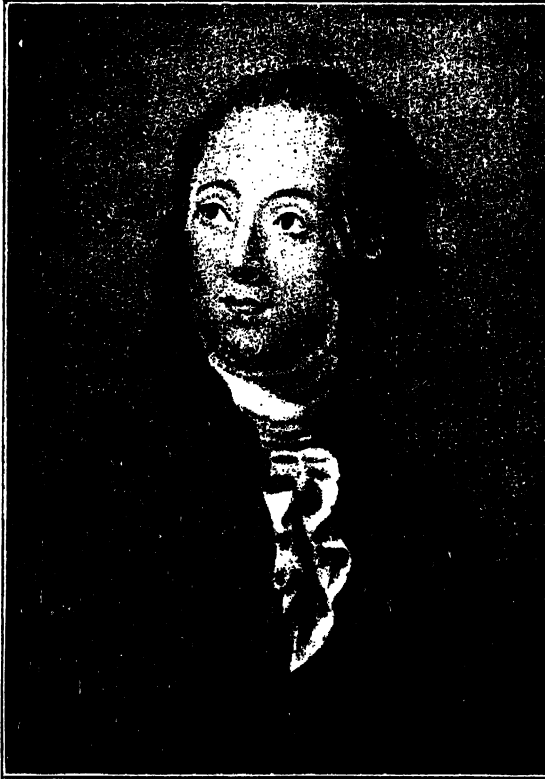
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ল্যাভোয়াসিয়ে ।

একজন ফরাসী রাসায়নিক বলিয়া গিয়াছেন,—“রসায়ন শাস্ত্র ফরাসীদেশীয় শাস্ত্র; ইহার জন্মদাতা অমরকীর্তিসম্পন্ন ল্যাভোয়াসিয়ে”। এই উক্তিটি অবশ্য স্বদেশহিতৈষণাপ্রেরিত বা অতিরঞ্জিত নহে। বাস্তবিকপক্ষে যদি নব্যরসায়নের জন্মদাতা বলিয়া কোন একজন মহাপুরুষকে নির্দেশ করিতে হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় সে ব্যক্তি ফরাসীদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ল্যাভোয়াসিয়ে। তিনি প্রাচীন রসায়ন জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বেরুপভাবে তমসাবৃত ভাস্তধারণার মধ্যে সত্যের বিমল আলোক আনয়ন করিয়া সমগ্র ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজকে নূতন পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে নব্যরসায়নের জন্মদাতা না বলিয়া থাকা যায় না। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষকে উন্নত ফরাসী বিপ্লবের সময় অকালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বাতকের হস্তে দেহ বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। একজন দর্শক সেই সময় বলিয়াছিলেন, “এইরূপ একজনের মস্তক কাটিয়া ফেলিতে এক মুহূর্তও লাগে না, কিন্তু এইরূপ আর একটি মস্তিষ্ক এক শত বৎসরেও জন্মিবে কি না সন্দেহের বিষয়।”

এণ্টিয়েন লোঁরা ল্যাভোয়াসিয়ে (Antion Laurent

Lavoisier) ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী প্যারিস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গণিতশাস্ত্রবেত্তা, বিশ্বাকর্ষণের আবিষ্কর্তা নিউটনের ঠিক এক শত বৎসর পরে ল্যাবোয়াসিয়ের জন্ম হয়।



ল্যাবোয়াসিয়ে

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কোন ক্রটি করেন নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক, অনেক বৈজ্ঞানিক মহাপুরুষের বালে এই সৌভাগ্য ঘটয়া উঠে নাই, অনেকেরই অর্থাভাবে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় নাই, পরে তাঁহার স্বকীয় সাধনার বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা অমর হইয়া গিয়াছেন। ল্যাভোয়াসিয়ে প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট গণিতশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে রসায়নের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ রাউলের অধ্যাপনায় তাঁহার দৃষ্টি রসায়নশাস্ত্রের উপর সমধিক পতিত হয়। অধ্যাপক রাউলের অধ্যাপনা সমগ্র ফরাসীদেশে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ল্যাভোয়াসিয়ের সমসাময়িক অনেক প্রসিদ্ধ রাসায়নিক তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্র আইনশিক্ষা করেন এবং বাস্তবিক একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ল্যাভোয়াসিয়ে আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকাতে তিনি আইনব্যবসার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানচর্চার জ্ঞাত জীবন উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ হইল। বাইশ বৎসর কালে তিনি তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহার পরবৎসর “বৃহৎ নগর আলোকিত করিবার উপায়” নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-পরিষদ ফরাসী একাডেমী হইতে একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং সেই বৎসরেই ঐ পরিষদের সভ্যরূপে নির্বাচিত হন। এই ফরাসী একাডেমী ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসীদেশে জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা

রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাত্রেই এই পরিবাদের সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া যুবক ল্যাভোয়াসিয়ের মৌলিক অনুসন্ধানের আগ্রহ বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। মৌলিক গবেষণার প্রবৃত্তি ঠিক সংক্রামক ব্যাধির ত্যায় ক্রিয়াশীল। যেমন কোন সংক্রামক ব্যাধি এক শরীর হইতে অপর শরীরে স্বতই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসর্গ গুণে নবাগত সাধকের সাধনার প্রবৃত্তি স্বতই উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষা যাহার হৃদয়ে একবার স্থান পাইয়াছে তিনি অনন্তকাল হইয়া গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেমন এক দিকে বহু উচ্চ উপাধিধারী যুবক এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রাণিত হইতে না পারিয়া সাধনার মন্দির হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ অপর দিকে অনেক ভাগ্যবান যুবক অল্প শিক্ষিত হইয়াও সংসর্গগুণে জ্ঞানার্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় আকুল হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

ফরাসী একাডেমীর সভ্যগণ বৎসর বৎসর নানাবিষয়ে বিবরণী প্রকাশ করিতেন। ল্যাভোয়াসিয়ের অসামান্য প্রতিভা ও নানা-বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শনে একাডেমীর কর্তৃপক্ষগণ ঐ সকল বিবরণী প্রকাশের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। তিনি কয়েক বৎসরে দুই শত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণী লিখিয়াছিলেন। এইরূপে ফরাসী একাডেমীর সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, সে সম্বন্ধ তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘোর ফরাসী বিপ্লবের সময়, যখন সমস্ত বিদ্বৎসমাজ বন্ধ করিবার জন্ত প্রস্তাব চলিতেছিল, তখনও তিনি একাডেমীকে পিতৃবৎ রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। আপনার অর্থব্যয় করিয়া প্রাচীন জরাজীর্ণ

বৈজ্ঞানিকগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়া একাডেমীকেই বাঁচায়া রাখিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই রাজাঙ্গায় ফরাসী একাডেমীর অন্তিম লোপ পাইল।

ল্যাভোয়্যাসিয়ের অর্থের কোনদিন অভাব ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর তিনি বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি অর্থাগমের অল্প উপায় অবলম্বন না করিয়া অনন্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু ভবিষ্যত তাহা ঘটিতে দিল না। তিনি যখন বিজ্ঞানের মন্দিরে এক পদ স্থাপন করিলেন, তখনই অজ্ঞাত-সারে ফাঁসিকাঠের প্রথম সোপানে তাঁহার অপর পদ স্থাপিত হইল। তিনি ফার্মিয়ে-জেনারল (Fermier-General) হইলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসীদেশে যাহারা রাজত্ব ও বাণিজ্যশুল্ক সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ঐ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারা থানিকটা তালুক ইজারা করিয়া লইতেন এবং রাজসরকারের সহিত ছয় বৎসরের রাজত্ব ও বাণিজ্যশুল্ক আগাম দিবার বন্দোবস্ত করিতেন। নির্দিষ্ট রাজস্বের উপর আরও অধিক মুদ্রা গোপনে রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে উপহার দিতে হইত। ফলে দরিদ্র প্রজার উপর যথেষ্ট অত্যাচার উৎপীড়ন হইত। ঘুঘু, জুয়াচুরী, জুলুম ফার্মিয়ের নিত্য সহচর ছিল। অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও দরিদ্র প্রজাবর্গ সুবিচার প্রাপ্ত হইত না, উপরন্তু নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে সমর্থ না হইলে তাহাদিগকে বিষম শাস্তি ভোগ করিতে হইত। ফরাসী দেশের সর্বত্রই উৎপীড়িত প্রজাবর্গ এই প্রথাকে মর্মান্তিক ঘৃণার চক্ষে দেখিত। ইহাদের

মধ্যে সংযুক্তিও ছিলেন। ল্যাভোয়াসিয়ে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া নিজের এলাকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ভিন্নদেশ হইতে যেসব পশু আনয়ন করিয়া পশুর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও উৎপীড়িত জনসাধারণের ঘৃণার দৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পান নাই। শেষের দিনে তাঁহার অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, পবিত্র চরিত্র প্রভৃতি সকল সদগুণই লোকে ভুলিয়াছিল—সেদিন ফার্মিয়ে বলিয়াই সকলে তাহাকে মনে রাখিয়াছিল।

ল্যাভোয়াসিয়ের জীবন দুই প্রকার কার্যে অতিবাহিত হইয়াছিল—প্রথম বিজ্ঞানের সেবা, দ্বিতীয় দেশের সেবা। দেশের নানাবিধ মঙ্গলময় কার্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন, রাজকীয় বিবিধ কার্যে তিনি রাজকীয় শক্তির সহায়তা করিতেন। বিশেষতঃ রাজসরকারে বারুদের কারখানার তিনি এক সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি বারুদ ও তৎসংক্রান্ত অগ্নাত দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি করিয়াছিলেন। যদি তিনি অন্তঃমনে বিজ্ঞানের সেবা করিতেন, তাঁহার সমগ্র শক্তি বিজ্ঞানের চর্চায় নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি করিতে পারিতেন কে বলিতে পারে! যখন তাঁহার চতুর্দিকে বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিল, তখন তিনি রাজনীতির কোলাহল-মুখরিত কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানাগারের চিরশীতল শ্রামল শিখচ্ছায়ায় সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুবর্গ তাহাকে অব্যাহতি দেয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে যে মাসে তিনি এবং আরও সাতাইশ জন ফার্মিয়ে-জেনারাল রাজস্ব আত্মসাৎ করিবার আক্ৰোহে অভিযুক্ত হন। ল্যাভোয়সিয়ে যে সকল অপরাধের জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তামাকে জল ও অগ্ন্যন্ত্র অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশ্রিত করা তাহার অন্যতম। যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় পিতা পুত্রকে ভুলিয়াছিল, বন্ধু বন্ধুর মস্তক ছেদন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই, সে সময়ে তামাকে জল দেওয়াও যে একটা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহাতে নিচিৎ কি? বিচারপতি কফিনালের নিকট এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তির বিচার হইতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দেশহিতকর কার্যের জন্য তাঁহার মুক্তি ভিক্ষা করিয়া বহু গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র বিচারপতিকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পক্ষের উকিল তাঁহার পক্ষ হইতে যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যাভোয়সিয়ে তাঁহার আরও একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা শেষ করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কফিনাল সে সকল আবেদন পত্র চেলিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন “ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন নাই, শ্রায়বিচার হইলেই যথেষ্ট হইল।” তিনি শ্রায় বিচারে এই আটাইশ জন হতভাগ্য ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে এতই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাড়াতাড়িতে জুরির মন্তব্য পর্যন্ত লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের এমনই বিড়ম্বনা যে কয়েকমাস পরে যখন এই কফিনাল আবার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহার নিজকৃত ভ্রম অনুযায়ী জুরির মন্তব্য না লইয়াই তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে

হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে এই আটাইশ জন ব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। ল্যাবোয়াসিয়ে তাঁহার শব্দের নম্রক কবিত্ত হইতে দেখিলেন। তাঁহারা সকলে এমনই হৈর্যা ও গাঙ্গীর্থ্যের সহিত তাঁহাদের নিজ নিজ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন যে উপস্থিত জনসংঘ তাহা দেখিয়া বিশ্বয়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোনও অপমানস্থচক বাক্য অন্তিমকালে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই।

এইরূপে একাদশবৎসর বয়সে আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা ল্যাবোয়াসিয়ে ষাতকের হস্তে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপের বিদ্বৎসমাজ লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, হুঃখিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রোবেঞ্চিয়ারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদেশের জনসাধারণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। পর বৎসর ল্যাবোয়াসিয়ের পুণ্যস্থিতির সম্মান করিবার জ্ঞাত রাজসরকারের পক্ষ হইতে বিপুল আয়োজন সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। ল্যাবোয়াসিয়ের পত্নী তাঁহার মৃত্যুর পর কাউণ্ট রমফর্ড নামক আর একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে বিবাহ করেন।

ল্যাবোয়াসিয়ে কিরূপে নব্যরসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা সম্যাকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্বের রসায়ন শাস্ত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা পর্যবেক্ষণ এবং তাঁহার সমসাময়িক অগ্র অগ্র রাসায়নিকগণের কার্যাবলীর আলোচনা করা আবশ্যক। ইউরোপে গ্রীক ও আরবীয়গণই বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতের অতীত গৌরবের যুগে হিন্দু আচার্যগণ যে সকল বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহার

পরিচয় সভ্যজগত ক্রমে ক্রমে পাইতেছেন। এবিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এখনও অনেক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অনুসন্ধানের গুরুভার এতদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর হস্ত ছিল, সেই ভার ক্রমে আমাদের নিজেদের স্বন্ধে আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ পরিবর্তনের ফল ভাল বই মন্দ হইতেছে না, কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে যতই ব্যুৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি, স্বাভাবিক গ্রীকপ্রীতি এবং ভারতবর্ষের ভাষা ও আচার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রায়ই ব্যাহত হইতেছে দেখা যায়। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে ল্যাবোয়াসিয়ার প্রতিষ্ঠিত নব্যরসায়নের জন্মের পূর্বে এক প্রাচীনতর রসায়ন যেমন ইউরোপ ও মিসরদেশে বর্তমান ছিল, সেইরূপ ভারতের উর্বর ক্ষেত্রেও উহার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালক্রমে বর্ধিত, পুষ্পিত ও ফলশালী হইয়া উত্তরকালে গুকাইয়া গিয়াছিল। এমন কি, অনেক বিষয়ে ভারতের রসায়ন জ্ঞান তাৎকালিক গ্রীক ও আরবীয় রসায়নজ্ঞান অপেক্ষা উন্নতিশালী ছিল। ভারতের নাগার্জুন, চক্রপাণি ইউরোপের পারাসেল্‌সের অনেক শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

এই প্রাচীন রসায়নের উন্নতি দুইটি প্রধান বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া সাধিত হইয়াছিল—একটি, চিকিৎসার জন্ত ঔষধ সংগ্রহ কার্য; অপরটি কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা। ভারতে ও ইউরোপে উভয় স্থানেই এইরূপে রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল—তবে ভারতে চিকিৎসাই রসায়ন শাস্ত্রের মুখ্য অবলম্বন ছিল। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি কল্পে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ না হইয়াছিল ততদিন উহার উন্নতি

দ্রুত হইতে পারে নাই। ইংলণ্ডের স্মুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রবার্ট বয়েল সর্বপ্রথমে রসায়ন শাস্ত্রকে কৃত্রিম স্বর্ণপ্রস্তুতকারীদিগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় রসায়ন শাস্ত্র রাসায়নিক জ্ঞানের উন্নতি করে অধীত ও আলোচিত হইতে থাকে। স্বাধীন চিন্তায় উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং তাহার ফলে মৌলিক গবেষণায় উহার কলেবর দিনদিন পুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে প্রাচীন রসায়ন হইতে নব্যরসায়নের জন্মের সম্ভাবনা স্চিত হয়।

প্রাচীন রসায়নের দ্বিতীয় ক্রটি ছিল যে উহা পরিমাণাত্মক (quantitative) শাস্ত্র ছিল না। এই দ্রব্যের সহিত এই এই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে অমুক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কত পরিমাণ অপরাপর দ্রব্যের কত অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া কত ওজনের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ণিত হইত না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তুলাদণ্ডের প্রচলন প্রাচীন রসায়নে বড় একটা ছিল না। ল্যাভোরাসিয়ে যে এক নব্যতর রসায়ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার প্রধান রহস্য হইতেছে যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পদে পদে তুলাদণ্ডের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহা কেবল বস্তুগত শাস্ত্র ছিল তাহা পরিমাণাত্মক হইয়া দাঁড়ইল।

বস্তুর বিনাশ নাই।

“বস্তুর বিনাশ নাই” এই নহাসত্য ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

মতে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্য পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এবং দ্রব্যের বিনাশ হইলে পুনরায় তাহা পঞ্চভূতে পরিণত হয়; অর্থাৎ সৃষ্টি পঞ্চভূতের সমবায় এবং বিনাশ পঞ্চভূতে পরিণতি। এরূপ অল্পমানে বস্তুর অবিনশ্বরত্ব বেশ স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। ল্যাভোয়্যাসিয়ে এই অল্পমানকে তুলাদণ্ডের কণ্ঠিপাথরে ঘসিয়া খাঁটি পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি প্রাচীনেরা তুলাদণ্ডের ব্যবহার বড় একটা শিখেন নাই, তাঁহারা যুক্তি কল্পনা ও অল্পমানের সাহায্যে সত্যের সন্ধান করিতেন। বিজ্ঞান সেই সকল সত্যকে পরিমাণাত্মক পরীক্ষামূলক সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। ল্যাভোয়্যাসিয়ে এই পরিমাণাত্মক বিজ্ঞানের একজন প্রধান স্থাপয়িতা।

বস্তুর অবিনশ্বরতা সপ্রমাণ করিবার জন্ত ল্যাভোয়্যাসিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন। একটি কাচনির্মিত বড় বকযন্ত্রে (glass retort) নির্দিষ্ট ওজনের রঙ্গ অর্থাৎ টিন বা রাং গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ রাং গলিয়া না গিয়াছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাকে বালুকাযন্ত্রে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তাপ বশতঃ যেটুকু বায়ু বহির্গত হইয়া গেল তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া ওজন করিলেন, তৎপরে বকযন্ত্রের সরু মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া ওজন করিলেন। বন্ধাবস্থায় বকযন্ত্রকে পুনরায় উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে রাং রাং-ভস্মে পরিণত করিতে লাগিলেন। বায়ু যত বেশী থাকিবে রাংও তত বেশী পরিমাণে ভস্মে পরিণত হইবে। যখন দেখিলেন আর রাংভস্মে পরিণত হইতেছে না তখন বকযন্ত্রকে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় তাহার ওজন লইলেন। দেখিলেন তাহার ওজন কমেও নাই বাড়েও নাই, ঠিকই আছে। যদিও রাং রাংভস্মে

পরিণত হইয়াছে—যদিও এখানে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছে—তথাপি রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে ওজন ঠিক আছে।

বকযন্ত্র ঠাণ্ডা হইলে তাহার সরু মুখ পুনরায় খুলিয়া ফেলিলেন এবং তখন দেখা গেল যে বাহিরের বায়ু সশব্দে বকযন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিল। কেন প্রবেশ করিল?—রাং ভস্ম হইবার সময় ভিতরকার বায়ুর কিয়দংশ টানিয়া লইয়াছিল বলিয়া। বকযন্ত্রের মুখ খুলিবার সময় বাহিরের বায়ু ভিতরের সেই শূন্যস্থান অধিকার করিবার জন্য সশব্দে প্রবেশ করিল। ল্যাবোরাসিয়ে পুনরায় এই বায়ুপূর্ণ বকযন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলেন,—ওজন প্রায় দশ গ্রেণ বাড়িয়াছে। তৎপরে রাংভস্ম ও বাকি রাং একত্রে ওজন করিয়া দেখিলেন যে গৃহীত রাঙ অপেক্ষা রাঙ ভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। রাংভস্মের ওজন কতটা বাড়িয়াছে?—তিনি দেখিতে পাইলেন বকযন্ত্রের ভিতরে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল ঠিক সেই পরিমাণে রাং অপেক্ষা রাংভস্মের ওজন বাড়িয়াছে। উত্তপ্ত করিবার পর বদ্ধ বকযন্ত্রের মুখ ভাঙ্গাতে যতটুকু বায়ু প্রবেশ করিল,—তাহা হইতে বকযন্ত্রকে বদ্ধ করিবার পূর্বে উত্তপ্ত করিবার সময় যতটুকু বাহির হইয়াছিল তাহার ওজন বাদ দিলে বায়ুর ওজন যতটা কমিয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে।

তবেই দেখা গেল যে রাংকে রাংভস্মে পরিণত করিবার সময় নূতন বস্তুর (matter) সৃষ্টি হয় নাই। নির্দিষ্ট ওজনের রাং নির্দিষ্ট ওজন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দুয়ের সমষ্টি ওজনের রাংভস্মে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বস্তুর পরিবর্তন হয় মাত্র, সৃজন বা

বিনাশ হয় না। সকলেই দেখিয়াছেন একটি বাতি পুড়িতে পুড়িতে কমিয়া যায়, মৃতদেহ শ্মশানে ধু ধু করিয়া জলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছাই হইয়া যায়। জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিক কি বর্জিকা বা মৃতদেহের বিনাশ সাধিত হইল? দেখিতে পাই, সর্বপ্রমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমে বৃহৎ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। জিজ্ঞাস্য এই যে, নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইল কি? বাস্তবিক তাহা নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে বাতি জলিয়া বায়ুর অল্পজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল ও কার্বনিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন করে এবং এই দুই পদার্থ সংগ্রহ করিয়া ওজন করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের মিলিত ওজন বাতির ওজন অপেক্ষা কমত নহেই বরং বেশী। বেশী হইবার কারণ—সংযুক্ত অল্পজানের ওজন। সেইরূপ মৃতদেহ দগ্ধ হইয়া খানিকটা অংশ ভস্মে পরিণত হয়, খানিকটা অংশ জলীয় বাষ্প ও গ্যাসে পরিণত হয়। বীজ হইতে যখন সূর্য্যবৃক্ষ উৎপন্ন হয় তখন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না। কোন অজানিত শক্তির বলে বীজ চারিদিক হইতে গ্যাস, জল, সার, বায়ু প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। যদি এই তাবৎ জল, সার প্রভৃতি ওজন করা যাইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে তাহাদের মিলিত ওজন বৃক্ষের সমান। বাস্তবিক জগতে যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বস্তুর সৃজন বা বিনাশ হইত, তাহা হইলে এতদিনে বস্তুর আধিক্য বা অল্পতাপ্রযুক্ত জগতের নাশ হইয়া যাইত। বস্তুর অবিনশ্বরত্বের উপর সমগ্র রসায়ন শাস্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। ল্যাভোয়্যাসিয়ে এই ভিত্তিকে পরিমাণাত্মক সত্যে পরিণত করিয়া রাসায়ন শাস্ত্রকে পরিমাণাত্মক শাস্ত্রে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।

ফ্লজিষ্টনবাদ ।

প্রাচীন রসায়নে দুইটিমাত্র প্রধান অনুমান (theory) প্রচলিত ছিল—প্রথম, বৈশেষিকদর্শনকার কণাদ ও গ্রীক দার্শনিক ডিমক্রাইটস ও এপিকিউরাসের পরমাণুবাদ (atomic theory) ; এবং দ্বিতীয়, এরিষ্টটলের চতুর্ভূতবাদ ও হিন্দুদর্শনের উন্নততর পঞ্চভূতবাদ । ১৭২০ খৃঃ অব্দে জার্মানির সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক ষ্টাল (Stahl) ফ্লজিষ্টনবাদ নামক তৃতীয় সংখ্যক অনুমান প্রচার করেন । তাঁহার জিজ্ঞাস্তা হইল, দাহ্যবস্তু যখন জলে তখন কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে ? কাষ্ঠ, কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে জলে কেন ? লৌহ, যশদ, রাং প্রভৃতি ধাতু উত্তাপ সংযোগে যখন ভস্মে পরিণত হয়, তখন কি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ? এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ষ্টাল শেষে ঠিক করিলেন যে, দাহ্যবস্তুমাত্রের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে বাহা দহনকালে ঐ বস্তু হইতে পৃথক হইয়া উড়িয়া যায় । তিনি সেই পদার্থের নাম দিলেন ফ্লজিষ্টন (Phlogiston) । যে দ্রব্যে ফ্লজিষ্টন যত বেশী আছে সে বস্তু তত বেশী দহনশীল । তাঁহার মত অনুসারে দহনক্রিয়া—তাহা কাষ্ঠদহনের ত্রায় দ্রুত হোক বা ধাতুমাংসের ত্রায় মৃদু হউক—দাহ্যবস্তু হইতে ফ্লজিষ্টনকে পৃথক করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছু নহে । তাহা হইলে ধাতুভস্ম ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতুমাত্র । ষ্টাল জানিতেন যে সীসকভস্ম, রাংভস্ম প্রভৃতি ধাতুভস্ম, কয়লা প্রভৃতি অঙ্গারমূলক পদার্থের সহিত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় মূলধাতুতে পরিণত হয় । এ বিষয়টি তিনি তাঁহার অনুমানের

সাহায্যে বেশ সহজে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে ধাতুভস্ম যখন ফ্লজিষ্টনবিহীন ধাতু ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন তাহাতে কয়লার সাহায্যে ফ্লজিষ্টন সংযোগ করিয়া দিলে উহা পুনরায় ধাতুতে পরিণত হইবে।

ষ্টালের এই অনুমানের অনেকেই পরিপোষক হইয়া উঠিলেন। অনুমান যতদিন পরীক্ষিত তথ্যের বিরোধী না হয়, ততক্ষণ উহা গ্রহণীয়। ষ্টালের অনুমানের সত্যাসত্য একটি পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর নির্ভর করিতোছিল। সেটি এই,—যদি ষ্টালের অনুমান সত্য হয়, অর্থাৎ দহনকালে যদি কোন পদার্থ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে কোন দ্রব্য পুড়িয়া বাইলে তাহার ওজন অবশ্য কমিয়া বাইবে। একপাণ্ড কাষ্ঠ পুড়িয়া বাইলে যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহার ওজন অশেষ কাষ্ঠের ওজন অপেক্ষা কম। কিন্তু কাষ্ঠদহনকালে ভস্ম ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এই সকলের মিলিত ওজনের নির্ণয় করা কঠিন; সেইজন্য কাষ্ঠ দহনকালে কেবলমাত্র ভস্মের ওজনের দ্বারা ষ্টালের অনুমানের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ধাতুকে দগ্ধ করিলে কেবলমাত্র ধাতুভস্ম প্রস্তুত হয়। এখন দেখিতে হইবে, প্রাপ্ত ধাতুভস্মের ওজন মূলধাতুর ওজন অপেক্ষা কম না বেশী। যদি কম হয় ষ্টালের অনুমান যথার্থ, আর যদি বেশী হয় তাহা হইলে উহা ভ্রান্ত। ষ্টালের পূর্বেরই পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল যে ধাতুকে ভস্মে পরিণত করিলে তাহার ওজনত কমেই না বরং বাড়িয়া থাকে। রবার্ট রয়েল রাংকে ভস্মে পরিণত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে গৃহীত রাং অপেক্ষা প্রাপ্ত রাংভস্মের

ওজন অনেক বেশী। জন মেয়ো নামক ইংলণ্ডের আর একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক এন্টিমনি নামক ধাতুকে ভস্ম করিয়া দেখাইয়া ছিলেন যে ধাতুভস্ম গৃহীত ধাতু অপেক্ষা ওজনে ভারী। ইহাদের পরীক্ষার ফল ষ্টালের অবিদিত ছিল না; কিন্তু তিনি ইহার প্রতি বড় একটা মনোযোগ করেন নাই।

কিছুকাল পরে যখন এই বিষয়ে রাসায়নিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল তখন ফ্লজিষ্টনবাদের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একটা গোল বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ইহার একটা “উড়ো” মীমাংসা করিয়া দিবার জন্ত বলিলেন যে, ফ্লজিষ্টনের ওজন নাই, উহা মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া বরং বিপরীতদিকে উঠিয়া যায়। সুতরাং ইহার সংযোগে দ্রব্যের ওজন কমে ও বিয়োজে ওজন বাড়ে। এ একটা বড় অদ্ভুত মীমাংসা। যদি ফ্লজিষ্টন মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে উহা কোন জাতীয় পদার্থ এবং কিরূপেই অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইবে? অনেক দিনের পুঞ্জীভূত দ্রান্ত ধারণা সহজে যায় না। এক্ষেত্রেও এইরূপ একটা কাল্পনিক মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাৎকালিক রাসায়নিকগণ ফ্লজিষ্টনবাদের ভুল দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

এই ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া রসায়নকে নূতন ভিত্তির উপর স্থাপন করা ল্যাভোরাসিয়ের প্রধান গৌরবশক্তি মহাকর্ষিত। তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক জোসেফ প্রিষ্টলে ও হেনরী কেভেণ্ডিস, স্কটলণ্ডের জোসেফ ব্ল্যাক, সুইডেনের শিলে প্রভৃতি যাবতীয় রাসায়নিকই এই ফ্লজিষ্টনবাদের পরিপোষক ছিলেন। তাৎকালিক সমগ্র রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের ভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

এরূপ ক্ষেত্রে নানা বাধাবিঘ্ন আপত্তি থগুন করিয়া ল্যাভোয়্যাসিয়ে অকুতোভয়ে ফ্লজিষ্টনবাদ ভ্রমাত্মক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নূতন কথা প্রথমে যখন প্রচারিত হয়, লোকে তখন তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না। শেষে সত্যের জয় অবশ্যই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমে অনেকেই ল্যাভোয়্যাসিয়ের বিরোধী হইয়াছিলেন। ক্রমে সত্যের জয় হইল। কিরূপে ল্যাভোয়্যাসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদের ভ্রম সন্মারূপে দেখিতে পাইলেন, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

প্রিষ্টলে কর্তৃক অক্সিজানের (Oxygen)

আবিষ্কার।

ধাতু অপেক্ষা ধাতুভঙ্গের ওজন অধিক এই সত্য আবিষ্কারের পর ফ্লজিষ্টনবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ধাতুভঙ্গের ওজনবৃদ্ধির হেতু সঠিক নির্ণীত না হইয়াছিল ততদিন ফ্লজিষ্টনবাদের বিরুদ্ধে ল্যাভোয়্যাসিয়ে কোনও নূতন নত প্রচার করিতে পারেন নাই। সেইজন্ত ধাতুর সহিত কোন পদার্থ যুক্ত হইলে ধাতুভঙ্গ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত ল্যাভোয়্যাসিয়ে সচেষ্ট থাকিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সমসাময়িক ইংলণ্ডের দুইজন প্রতিভাশালী রাসায়নিক দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার করিলেন। জোসেফ প্রিষ্টলের (Joseph Priestley) দ্বারা অক্সিজান এবং হেনরী কেভেণ্ডিসের (Henry Cavendish) দ্বারা জলের রাসায়নিকস্বরূপ আবিষ্কৃত হইল। এই দুইটি আবিষ্কারের

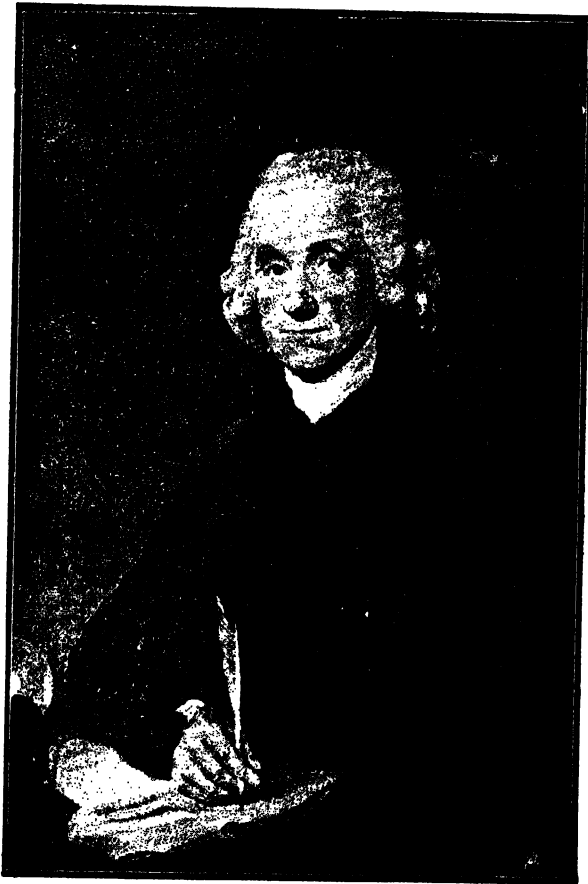
ফলে ল্যাবোয়াসিয়ে ফ্লজিষ্টনবাদকে চিরদিনের জ্ঞাত রসায়নশাস্ত্র হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অল্পজানের আবিষ্কর্তা জোসেফ প্রিষ্টলে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি লিড্‌স্ নামক সহরের নিকটবর্তী ফিন্ডহেডস্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। বাল্যকালে তাঁহার রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই এবং উত্তরকালে তিনি ধর্ম্মবাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে ধর্ম্মবাজকের কর্ম্ম করিবার পর অবশেষে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লিড্‌স্‌ে মিলহিল চ্যাপেলের ধর্ম্মবাজকের পদ প্রাপ্ত হন। সোভাগাক্রমে (ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে বড়ই ভূর্ভাগাক্রমে) তাঁহার গির্জার ঠিক পাশেই নদ চুয়াইবার একটি কারখানা ছিল। অনেকেই জানেন যে, নদ চুয়াইবার সমগ্র এক প্রকার “বায়ু” বাহির হইতে থাকে, তাহাকে আমরা এখন অক্সারাম (carbonic acid gas) বলি। প্রিষ্টলের ইচ্ছা জন্মিল যে এই “বায়ু” তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই “বায়ু” পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি এতগুলি “বায়ুর” স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তিনি “বায়বীয় রসায়নের জন্মদাতা” বলিয়া রসায়নশাস্ত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

এখানকার মত দ্বিতল বা ত্রিতল নানা যন্ত্রসময়িত রসশালা *

* “রসশালা” Chemical laboratory অর্থে ব্যবহৃত হইল। রসরত্নসমুচ্চয়ে এই রসশালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অতএব “রাসায়নিক পরীক্ষাগার” প্রভৃতি কথা গড়িবার দরকার নাই।

তখন ছিল না। প্রিষ্টলের রাসায়নিক যন্ত্রের মধ্যে কাচের
লম্বা লম্বা শিশি, বোতল, ছিপি, জলপাত্র, পারদ, চামড়ার থলি
প্রভৃতি সামান্য সামান্য দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।



জোসেফ প্রিষ্টলে

কিন্তু এই সামান্য শিশি বোতলের সাহায্যে প্রিষ্টলে অল্পজ্ঞানের আবিষ্কার, বায়ুর আংশিক স্বরূপ নির্ণয়, জলের স্বরূপ নির্ণয়ের পত্তা আবিষ্কার, হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাসের আবিষ্কার প্রভৃতি বিবিধ রাসায়নিক আবিষ্কারের দ্বারা রাসায়নিক জগতে বরণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানাবিধ “বায়ু”র পরীক্ষার ফল তিনভাগে বিভক্ত একখানি বৃহৎ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত আবিষ্কারের বর্ণনা করিবার স্থান আনাদের নাই; আমরা এখানে কেবল তাঁহার অল্পজ্ঞানের আবিষ্কার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রিষ্টলের নিকট একটি ভাল আতসী কাচ (burning glass) ছিল। তিনি এই আতসী কাচের দ্বারা সূর্য্যতাপ একত্রীভূত করিয়া সেই তাপে নানা দ্রব্য পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই উপায়ে লোহিত পারদভস্ম (red oxide of mercury) উত্তপ্ত করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, উহা হইতে একপ্রকার গ্যাস বাহির হইতেছে। এই গ্যাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন। এই গ্যাসে মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা অনেক ভাল জলে। তিনি কয়েকটা ইঁচুর এই গ্যাসে এবং সমপরিমাণ সাধারণ বায়ুতে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে ইঁচুর সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই গ্যাসে বেশীক্ষণ বাঁচিয়া থাকে। তিনি নিজেও এই বায়ু শুঁকিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

“এই গ্যাস শুঁকিবার সময় ফুস্ফুসের উপর উহার ক্রিয়া সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন প্রকার বলিয়া অনুভব করি নাই, কিন্তু শুঁকিবার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত বক্ষদেশে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়াছিলাম। কালে হয়ত এই বায়ু

একটি বিলাসের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। আজ পর্য্যন্ত আমার সহিত দুইটি ইঁদুরও এই বায়ু সেবনের সুখ অনুভব করিয়াছে।”

প্রিষ্টলের ভবিষ্যদ্বাণী কতকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে। যদিও অল্পজ্ঞান এখনও বিলাসের সামগ্রী হয় নাই, তত্রাচ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে অল্পজ্ঞান শুঁকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা হয়।

এইরূপে লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিয়া প্রিষ্টলে সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্নগুণসম্পন্ন নূতন বায়ুর আবিষ্কার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য হইতে উহা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হইলেন। যেটে সিন্দূর (red lead) উত্তপ্ত করিয়া দেখিলেন যে উহা হইতেও পূর্ব্বোক্ত বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে তিনি এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনিও একজন ফ্লাজিষ্টনবাদী ছিলেন। এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন। “ফ্লাজিষ্টনহীন বায়ু”। এই বায়ুতে মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ভাল জলে, তাহার কারণ উহাতে সাধারণ বায়ু অপেক্ষা ফ্লাজিষ্টন কম আছে—তিনি এইরূপ দ্রাস্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন।

এই নূতন বায়ুর আবিষ্কার-সংবাদ ল্যাভোয়াসিয়ারের নিকট দৈববাণীরূপে পৌছিল। তাঁহার স্বক্ষদৃষ্টি দেখিতে পাইল যে এই নূতন বায়ু ফ্লাজিষ্টনবাদের মোহনয় আবরণ ভেদ করিবে। তিনি প্রথমে প্রিষ্টলের পরীক্ষার বিচার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রিষ্টলের বিপরীতগামী হইল। তিনি ভাবিলেন যে যখন মোমবাতি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা এই নূতন বায়ুতে অধিকতর উজ্জলভাবে জলে, তখন সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ু

১
অন্ত কোনপ্রকার বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে, এবং বাতি জলিবার সময় এই নূতন বায়ু বাতির উপাদানের সহিত সংযুক্ত হয়। তিনি সাধারণ বায়ু হইতে এই নূতন বায়ু আহরণ করিবার জন্য সচেষ্টিত হইয়া খানিকটা নির্দিষ্ট ওজনের পারদ একটি বকযন্ত্রে (retort) গ্রহণ করিলেন। এই বকযন্ত্রের মুখ, একটি পারদপাত্রে আংশিকভাবে নিমজ্জিত বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপাত্রে (bell-jar) প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রথমে একখণ্ড কাগজের দ্বারা কাচপাত্রে বায়ুর পরিমাণ নাপ করিয়া লইয়া বকযন্ত্রস্থিত পারদকে দ্বাদশ দিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল যে বায়ুর পরিমাণ প্রায় ছয় ভাগের একভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং বকযন্ত্রস্থিত পারদের উপর লোহিতবর্ণের পারদভগ্ন প্রস্তুত হইয়াছে। কাচপাত্রস্থিত অবশিষ্ট বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে আর বাতি জ্বলিতেছে না। পরে এইরূপে প্রাপ্ত লোহিত পারদভগ্ন উত্তপ্ত করিয়া তিনি উহা হইতে এই নূতন বায়ু অনেক খানি প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষার দ্বারা তিনি সাধারণ বায়ুতে এই নূতন বায়ুর অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিতে পারিলেন। আরও তিনি দেখাইলেন যে পারদ সাধারণ বায়ুস্থিত এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া পাদভগ্নে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্তান্ত ধাতুও এই নূতন বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ধাতুভগ্নে পরিণত হয়। এতদিনে তিনি যাহা অব্বেষণ করিতেছিলেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি এই নূতন বায়ুর নাম রাখিলেন “অক্সিজেন”।

এখন তিনি প্রচার করিলেন যে ফ্লজিষ্টনবাদ নিতান্ত ভ্রান্ত। ধাতু ভগ্ন হইলে তাহার ওজন কমে না, বরং বাড়িয়া থাকে।

এই ওজন বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই নয়—ধাতু সাধারণ বায়ুর অত্যন্ত উপাদান অল্পজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। যখন ধাতুভঙ্গ অঙ্গার প্রভৃতির সহিত উত্তপ্ত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয়, তখন অঙ্গার ধাতুভঙ্গের অল্পজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারাস্নে (carbonic acid gas) পরিণত হয় এবং অসংযুক্ত ধাতু পড়িয়া থাকে। ফ্লজিষ্টন বলিয়া কোন পদার্থ নাই এবং উহা কষ্টকরূপে মাত্র। প্রথম প্রথম তাঁহার নূতন মতের কেহই পোষকতা করিল না। কিন্তু শেষে সত্যেরই জয় হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই জীবদশাতেই ডি মরভিউ, বার্থোলে, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী এবং ব্ল্যাক প্রভৃতি স্বচ রাসায়নিকগণ তাঁহার মতের পোষকতা করিলেন। কেবল প্রিষ্টলে ও কেভেণ্ডিস আজীবন ফ্লজিষ্টনবাদী রহিয়া গেলেন।

কেভেণ্ডিস কর্তৃক জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ল্যাবোয়াসিয়ার অল্পজানবাদ একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পূর্বেই জানা ছিল যে যশদ (zinc) প্রভৃতি ধাতু যখন জলীয় হাইডোক্সোরিক বা সালফিউরিক অম্লে দ্রবীভূত হয় তখন উদজান (hydrogen) নামক একটি খুব লঘু গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং ধাতু ভঙ্গ হইয়া অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (salt) পরিণত হয়। ফ্লজিষ্টনবাদীরা বলিতেন যে এই অতি লঘু উদজানই ফ্লজিষ্টন ; এবং অল্প সংযোগে ধাতু হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট ধাতুভঙ্গ পড়িয়া থাকে। ল্যাবোয়াসিয়ে ইহার উত্তরে বলিলেন যে এই উদজান বায়ু লঘু হইলেও উহার ওজন আছে,

তবে উহা বাহির হইয়া যাইলে কেমন করিয়া ধাতুতন্ত্রের ওজন ধাতু অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে? তিনি ফ্লজিষ্টনবাদীদের ভ্রম দেখাইয়া দিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজ মতানুযায়ী কোন ভাল নীমাংসা তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে ইংলণ্ডের তাৎকালিক অত্যন্ত প্রধান রাসায়নিক কেভেণ্ডিস জলের রাসায়নিকস্বরূপ নির্ণয় করিলেন। প্রাচীন গ্রীকগণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ এই চারি ভূত ভিন্ন ব্যোম নামক সূক্ষ্মতর পঞ্চম মৌলিক পদার্থের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর হস্তে পড়িয়া অজ্ঞাতকুলশীল “ব্যোম” ভিন্ন অপর চারি ভূতের ভূতত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। প্রিষ্টলে, কেভেণ্ডিস, সিলে, ল্যাভোয়াসিয়ের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক দুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে। কেভেণ্ডিস জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিলেন। হেনরি কেভেণ্ডিস বড়ঘরের সন্তান ছিলেন—ডিউক অব ডেভনসায়ারের পৌত্র এবং লর্ড চার্লস কেভেণ্ডিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। তিদি প্রথমে হেক্‌নী স্কুলে পরে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেমন-এক-রকমের লোক ছিলেন, কাহারও সঙ্গে মিশিতে ন পারিতেন, খুব অল্পই কথাবার্তা কহিতেন এবং যদিও তিনি অনেক লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু এমনি তাঁহার নাম প্রকাশের ভীতি ছিল যে তাঁহার লেখা খুব অল্পই প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শেষ বয়সে প্রভূত ধনশালী হইয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খরচ কিছুই ছিল না। নিজের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি কখনও দৃকপাত করিতেন না এবং তাঁহার বাটীর 'আসবাব পত্র তাঁহার প্রকৃতির অনুযায়ীই ছিল। বাটীর যেটি বৈঠকখানা সেই ঘরটিকেই তিনি তাঁহার প্রধান যন্ত্রাগার



কেভেণ্ডিস

করিয়াছিলেন; দোতালার ঘরগুলিকে তিনি মানমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য তাঁহার নিকটে ছিল; কিন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ মুহূর্ত

উপস্থিত তখন সে ভৃত্যকেও বিদায় করিয়া দিলেন, এবং আদেশ করিলেন যেন সে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া না আসে। ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে তাহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে।

এই চিরনির্জ্ঞানতাপ্রিয়, সংসারবিরাগী ও কথঞ্চিৎ বিকৃত-মস্তিষ্ক ইংরাজ, তাঁহার সমগ্র জীবন, সাধনানিরত ভারতের যোগীর আশ্রয়, বিজ্ঞানের সেবায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি অক্ষশাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও রসায়নে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এ সকল বিষয়ে যে শুধু তাঁহার অসামান্য জ্ঞান ছিল তাহা নহে, তিনি এই সকল বিজ্ঞায় ভুরি ভুরি মৌলিক গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ, বায়ুর পরিমাণাত্মক রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তাপ সম্বন্ধীয় পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার এবং জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও নরুৎ এই চতুর্ভুতই তাঁহার স্বল্প দৃষ্টি ও পরীক্ষার অতীত ছিল না। তিনি ল্যাবোয়াসিয়ের মত তুল্যদণ্ডের ব্যবহার প্রত্যেক পরীক্ষায় করিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য কোন কোন ইংরাজ তাঁহাকেই রসায়ন-শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন।

কেভেণ্ডিস যে পরীক্ষার দ্বারা জলের যৌগিকত্ব সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন, প্রিষ্টলে তাঁহার পূর্বে সেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি ঐ পরীক্ষার গুঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিষ্টলে একটি কাচপাত্রে উদ্‌জান ও সাধারণ বায়ু একত্র মিশাইয়া তাহা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের (electric sparks) দ্বারা দগ্ধ করিলেন। এই দুই দ্রব্য সংযুক্ত হইলে পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে কাচপাত্রের ভিতরটা অল্প অল্প জলবিন্দুতে

সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন যে এই জল উদ্ভ্জান ও বায়ুর রাসায়নিক সংযোগে আসে নাই, উহা বোধ হয় বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প হইতে আসিয়াছে। মোট কথা তিনি এই জলের প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন নাই। করিলে তিনিই জলের রাসায়নিক উপাদানের আবিষ্কারের খ্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন। কেভেণ্ডিস প্রিষ্টলের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন যে এইরূপে প্রাপ্ত জল একটা অবাস্তব পদার্থ নহে; উহা উদ্ভ্জান ও বায়ুর অম্লজানের সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে। ক্রমশঃ তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে সমস্ত উদ্ভ্জান গ্যাস ও সাধারণ বায়ুর পঞ্চমাংশ একত্র সংযুক্ত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং এক সময়ে তিনি ১৩৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ জল এই উপায়ে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জলের কোনও স্বাদ বা গন্ধ ছিল না এবং উত্তপ্ত করিলে উহার সমস্ত অংশই বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত।

কেভেণ্ডিস ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বায়ুর পরিবর্তে বিশুদ্ধ অম্লজান গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে একভাগ পরিমাণ অম্লজান ও দুইভাগ পরিমাণ উদ্ভ্জান মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে সমস্ত গ্যাসই জলে পরিণত হয়, অসংযুক্ত অম্লজান বা উদ্ভ্জান অবশিষ্ট থাকে না। অতএব দুই ভাগ পরিমাণ উদ্ভ্জান ও এক ভাগ পরিমাণ অম্লজান সংযুক্ত হইলে বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কেভেণ্ডিসের একজন বন্ধু ও সহকারী—সার চার্লস ব্লাগডেন, কেভেণ্ডিসের এই সকল পরীক্ষার ফল ল্যাবোয়াসিয়ার গোচরে আনয়ন করেন। ল্যাবোয়াসিয়ে তৎক্ষণাৎ

কেভেণ্ডিসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করিয়া অনেকখানি জল প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আরও জলীয় বাষ্পকে একটি পোর্সিলেনের নলে উত্তপ্ত লৌহের উপর চালনা করিয়া উহা হইতে উদ্‌জ্ঞান বায়ু প্রাপ্ত হইলেন। এই পরীক্ষায় জলীয় বাষ্প বিযুক্ত (decomposed) হইয়া উদ্‌জ্ঞান ও অম্লজানে পরিণত হয় এবং অম্লজান গ্যাস লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া অক্সাইড অব আইরনে পরিণত হইয়া থাকে ও উদ্‌জ্ঞান বাহির হইয়া আসে। এখন এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা জলের রাসায়নিকস্বরূপ সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না।

ল্যাভোরাসিয়ে কেবল মাত্র এই সকল পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিলেন না। কেভেণ্ডিস ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত না হওয়াতে এই সকল পরীক্ষার মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। ল্যাভোরাসিয়ের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি উহার সন্ধান পাইয়াছিল। তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে এই আবিষ্কার ফ্লজিষ্টনবাদীদিগের শেষ আশাও নিশ্চূর্ণ করিবে। এতদিন তিনি ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে উদ্‌জ্ঞান কেন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে এখানে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে—প্রথমে জল বিযুক্ত হইয়া অম্লজান ও উদ্‌জ্ঞানে পরিণত হয় এবং পরে অম্লজানের সহিত ধাতু সংযুক্ত হইয়া ধাতুভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সেই ধাতুভস্ম অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া লবণে (Salt) পরিণত হইয়া থাকে এবং উদ্‌জ্ঞান বায়ু অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। অতএব ধাতু ও জলীয় অম্লের সংযোগে কাল্পনিক ফ্লজিষ্টনের উদ্ভবের কোনও

সম্পর্ক নাই, জলের বিয়োগে একদিকে উদ্ভাজন বায়ু বহির্গত হয় ও অপর দিকে ধাতুভঙ্গ প্রস্তুত হয়। এতদিনে ল্যাভোয়্যাসিয়ার জীবনব্রত উদ্ঘাপিত হইল।

ল্যাভোয়্যাসিয়ে কর্তৃক ফ্লজিষ্টনবাদের উচ্ছেদের বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হয়। কত অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্ত সহিষ্ণুতা, বিচিত্র ভাবপ্রবণতা এক একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কারকাহিনীকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ফ্লজিষ্টনবাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য কত মহাপুরুষ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—রবার্ট বয়েল, হুক, মেয়ো, ব্ল্যাক, প্রিষ্টলে, সিলে, বার্গমান, কেভেণ্ডিশ, কারওয়ান, রদারফোর্ড, জেমস্ ওয়াট ও সর্বোপরি ল্যাভোয়্যাসিয়ার গৌরবমণ্ডিত নাম ইহার সহিত জড়িত আছে। ইংরাজিতে একটি কথা আছে—“A chemist is the most patient animal, even the ass not excepted”—চিরসহিষ্ণু গর্দভ

অপেক্ষাও রাসায়নিককে সহিষ্ণু হইতে হয়। কেহ অশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমগ্র জীবন কেবল নানাবিধ পরীক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন, কেহ কেহ আবার এই সকল পরীক্ষাকে ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া তাহার উপর কোন নূতন অল্পমান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা সকলেই সাধনাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানের উন্নতিকেই একমাত্র ধ্রুব সত্য মনে করিয়া জ্ঞানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে কল্পনাশক্তি কেবল কবিরই প্রয়োজন কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নহে;—কি কবি, কি দার্শনিক, কি

বৈজ্ঞানিক, সকলেরই কল্পনাশক্তি, ভাবপ্রবণতা সমান প্রয়োজন। এই কল্পনাশক্তির বলে বৈজ্ঞানিক স্থলে স্বপ্ন দেখেন, দূর অনন্ত জ্যোতিকমণ্ডলীর আবর্তন নয়নের সম্মুখে দেখিতে পান, জড়-জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, আবর্তনবিবর্তন, আকৃতিবিকৃতি না দেখিয়াও দেখিতে পান। এই কল্পনাশক্তি, এই ভাবপ্রবণতা, এই স্বপ্নদৃষ্টি ল্যাভোরাসিসের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল। অপরে যেখানে উন্টা দেখিতেছিলেন সেখানে তিনিই কেবল সবই সোজা দেখিলেন। অপরের ও নিজের পরীক্ষার মধ্যে সত্য কোন অন্ধকারময় গহবরে লুক্কায়িত আছে তাহা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ল্যাভোরাসিসে এইরূপে ফ্লজিষ্টনবাদকে রাসায়নশাস্ত্র হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া প্রাচীন রাসায়নকে নূতনভাবে গঠিত করিতে লাগিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি মরভিউ, বার্থোলো, ফুরক্রয় প্রভৃতি ফরাসী রাসায়নিকগণ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পূর্বে যাবতীয় রাসায়নিক পরিভাষা ফ্লজিষ্টনবাদের অনুযায়ী ছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নূতন পরিভাষার সৃষ্টি হইল ও তিনি একখানি নূতন রাসায়নিক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ চিরদিন রাসায়নশাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট পরম আদরণীয় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থে তিনি জড়পদার্থকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তাহার পর বায়ুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ—অম্লজান, এজোট, (Azote, বা Nitrogen) জলীয় বাষ্প, অঙ্গারায় প্রভৃতির সংমিশ্রণ। পূর্বেকার “ফ্লজিষ্টিকেটেড বায়ু”, “ফ্লজিষ্টনহীন বায়ু”, প্রভৃতি কথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। জলের রাসায়নিক

বিশ্লেষণ, অম্ল, ক্ষার, লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক বিভাগ ও পরিভাষা লিপিবদ্ধ করিলেন। আধুনিক রসায়নের যতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয় তৎকালে ছিল সমস্তই গুছাইয়া নিজের মনোমত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ল্যাভোয়্যাসিয়ের অপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশদ পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ল্যাভোয়্যাসিয়ে প্রাণী-সমূহের শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখাইলেন যে প্রাণীগণের শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি এবং দহনক্রিয়া এই তিন প্রক্রিয়ার রাসায়নিক পরিবর্তন এক রকমের। প্রাণীগণ শ্বাস লইবার সময় শরীরের মধ্যে বায়ু গ্রহণ করে; বায়ুর অম্লজান শরীরের ভিতর ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অক্সারান্নে পরিণত হয় এবং উহা বায়ুর নাইট্রোজেনের * সহিত প্রশ্বাসরূপে বাহির হইয়া আসে। ধাতুভস্ম-প্রস্তুত-পদ্ধতি ও দহনক্রিয়া এই অম্লজানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

ল্যাভোয়্যাসিয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রাণিদেহের দ্বন্দ্ব

* ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় Nitrogenকে ‘স্ববক্ষারজান’ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ ‘স্ববক্ষার’ অর্থে ‘সোরা’ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু বৈদ্যকগ্রন্থে স্বব পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকেই “স্ববক্ষার” বলা হইয়াছে—উহা ক্ষার বিশেষ, সোরা আদৌ নহে। মৎপ্রণীত “আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন—স্ববক্ষার” দেখুন। সেইজন্য আমি Nitrogenকে “নাইট্রোজেন” বা “নেত্রজান” করিলাম—“স্ববক্ষারজান” করিলাম না।

লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কতকটা কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন রাজদ্বারে অভিযুক্ত, সেই সময় এই কাজটি শেষ করিবার জন্ত তিনি বিচারকের নিকট সময় ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতি কফিনাল ফরাসী সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন দেখিলেন না ; তিনি জুরির মন্তব্য না লিখিয়াই এই মহাপুরুষকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তৎপর দিবস তাঁহার নখর দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ মস্তিষ্ক-প্রসূত কার্যাবলীর গুণ্যস্মৃতি আজ বিশ্বের বহু নরনারী সাদরে পূজা করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

মাইকেল ফ্যারাডে ।

আমি যদি বলি যে, যে গোঁড়া বালক “বেঙ্গলি” বা “টিমুনান” কাগজ প্রত্যহ প্রাতে আপনার বাটীতে দিয়া আসে, সে বা তাহার দলের মধ্যে একজন কালক্রমে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের তায় বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিয়াছে, অথবা চাঁদনির চকে দপ্তরির দোকানে যে সকল ছোট ছোট ছেলে বহি ও খাতা বাঁধে তাহাদের মধ্যে একজন মস্তশক্তিবলে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের মত একজন রাসায়নিক হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে আপনি হে পাঠক ! আমার কথায় কি বিশ্বাস করিতে পারেন ? আপনি বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—অথ আপনাদিগকে যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত শুনাইব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাঁহার জীবনে একরূপ অসম্ভব বাস্তবিকই সম্ভব হইয়াছিল। দরিদ্র কামারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে বাল্যকালে দপ্তরি ও সংবাদপত্রবাহকের কর্ম্মই করিতেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনিই পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিৎ বলিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। একজন চিন্তাশীল লেখক প্রতিভার (genius) স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন “Genius consists in the capacity of taking unlimited pains” অর্থাৎ অশেষ পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাই প্রতিভার লক্ষণ। কিন্তু মনে হয় যে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাতেই কেবল প্রতিভার

পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আরও কিছু—দৈব, অতি-মাহুষিক—মানসিক ও নৈতিক শক্তি—প্রতিভাতে প্রচ্ছন্ন আকারে বিরাজ করে। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন প্রকার স্মৃতি না থাকিলে কানারের সন্তান মাইকেল ফ্যারাডে কোন্ পুণ্যবলে আজ বিশ্বের এতগুলি নরনারীর পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন ?

মাইকেল ফ্যারাডে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি সরে নামক কাউন্টিতে নিউইটন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার জন্মের পর তাঁহার পিতা পল্লীগ্রাম হইতে চিরদিনের জন্ত লণ্ডনে উঠিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা এত বেশী ছিল যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের অন্নকষ্টের সময় তাঁহাদিগকে দাতব্য সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সময় মাইকেলকে কখনও একপানি রুটি মাত্র খাইয়া সাত দিবস বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দরিদ্রের সন্তান মাইকেলের লেখাপড়া আর কি করিয়া হয়, তত্রাচ তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে স্কুলে দিয়াছিলেন। বালক মাইকেল স্কুলে লিখিতে, পড়িতে ও সামান্য অঙ্ক কসিতে শিখিয়াছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাইকেল ফ্যারাডে জর্জ রিবো নামক একজন পুস্তকবিক্রেতা ও দপ্তরির দোকানে সংবাদবাহকরূপে নিযুক্ত হইল। বাড়ী বাড়ী সংবাদ পত্র বহন করা তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। হয়ত এক বাটী হইতে অপর বাটীর ব্যবধান এক মাইলেরও উপর হইবে। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে মাইকেল

বইবাধার কার্যে শিক্ষানবিশভাবে নিযুক্ত হইলেন। বইত অনেকেই বাঁধে, কিন্তু সেই সকল বই পড়িবার প্রবৃত্তিত সকলের থাকে না। মাইকেলের মধ্যে যে প্রতিভা ফল্গুনদীর ছায়া অন্তঃসলিলা হইয়া রহিয়াছিল তাহাই তাহাকে এই সকল পুস্তক পাঠে নিয়োজিত করিল। মাইকেল বাধিবার জন্ত বই পাইলেই উহা আগে পড়িয়া লইতেন। বিজ্ঞানের বই তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে ওয়াট্‌স্ সাহেবরুত “মনস্তত্ত্ব” প্রথমে তাঁহাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিল এবং মিসেস মার্সেট রুত “রাসায়নিক কথাবার্ত্তা” ও “এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা” নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের মধ্যে “বিদ্যাৎ” নামক প্রবন্ধ তাঁহার মনকে প্রথম বিজ্ঞানের দিকে চালিত করে।

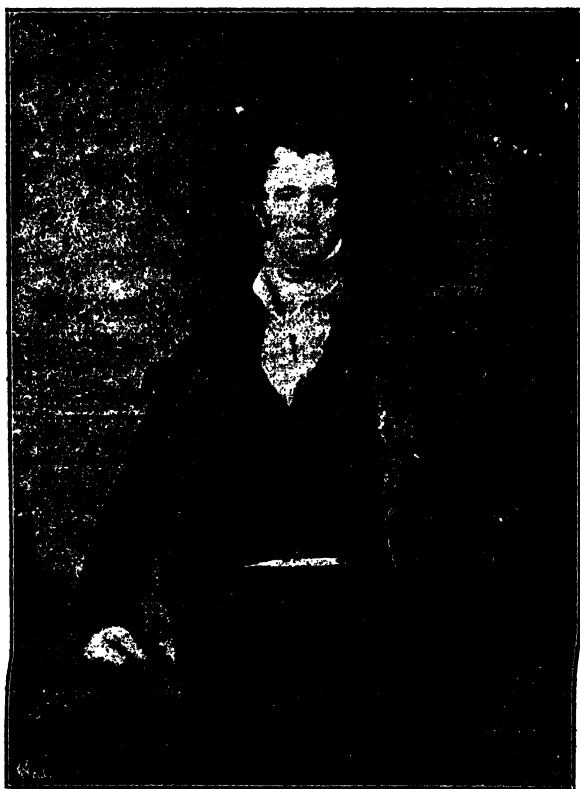
যে বিজ্ঞানের চর্চায় তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন সমুজ্জ্বল হইয়াছিল সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় এইরূপ অতি দীনভাবেই ঘটিয়াছিল। মাইকেলের স্বভাবশুলভ সরলতা ও সুমিষ্ট কথাবার্ত্তার জন্ত তাঁহার প্রভুর গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে মিষ্টার জন্স নামক এক ব্যক্তি ফ্যারাডেকে রয়েল ইন্সটিটিউশনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রী ডেভীর বক্তৃতা শ্রবণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের জন্ত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা এক রয়েল ইন্সটিটিউশন ভিন্ন অত্র কোথাও হইবার বন্দোবস্ত ছিল না। তখনও পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন সর্বসাধারণের উপকারের জন্ত বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হওয়া উচিত। এখন ইংলণ্ডে সর্বসাধারণকে বৈজ্ঞানিকজ্ঞান বিতরণ করিবার জন্ত নানা সভাসমিতি হইয়াছে। অধ্যাপক ষ্টয়ার্ট এই সকল

সভাসমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইংলণ্ডবাসীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভিন্ন অপরে বিজ্ঞান শিখিবার সুবিধা আদৌ পায় না। যে সকল যুবক নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না তাহারা বিজ্ঞানশিক্ষালাভে যাহাতে বঞ্চিত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কৰ্ত্তব্য। আমাদের মনে রাখা উচিত যে রয়েল ইন্সটিটিউশন না থাকিলে মাইকেল ফ্যারাডের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এই অভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং সর্বসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞানের বক্তৃতাাদি শ্রবণ করিলা জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহার জন্ত “ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর্ দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স” নামক বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কিন্তু ভরসা আছে কালক্রমে উহার সার্থকতা বর্দ্ধিত হইবে।

যে দিন মাইকেল ফ্যারাডে একখানি খাতা হাতে করিয়া রয়েল ইন্সটিটিউশনে ডেভীর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, সে দিবস ফ্যারাডে ও রয়েল ইন্সটিটিউশন—এই দুইয়ের—জীবনের একটি অরূপীয় দিবস। রয়েল ইন্সটিটিউশনের সহিত সম্পর্ক ফ্যারাডের সমগ্র জীবনে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূর্য্য রয়েল ইন্সটিটিউশনকে সমগ্র ইউরোপে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত ডেভী ও ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক যজ্ঞাবলী ঐখানে সমস্তে রক্ষিত আছে বলিয়া রয়েল ইন্সটিটিউশন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পরম পুণ্যময় তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত।

ডেভী তখন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্ত বিশ্ববিখ্যাত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফ্যারাডের মতন তিনিও খুব হীনাবস্থা
হইতে পরে স্বীয় প্রতিভার গুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ
করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালের অন্তঃপাতি পেন্‌জান্স



সার হামফ্রি ডেভী

নামক স্থানে ডেভীর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি এক ডাক্তার-
স্থানায় শিক্ষানবিশী করিতেন এবং সেই অল্প বয়সেই মদের গেলাস,

পুৰাতন ঔষধের শিশি, তানাকের নল এবং পিচকারি লইয়া নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেন। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ডাক্তার বেডোজ নামক একজন চিকিৎসকের সহকারী নিযুক্ত হন। এই সময়ে ডেভী, নাইট্রস্ অক্সাইড (nitrous oxide) নামক গ্যাস লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। পূর্বে এই গ্যাস অত্যন্ত বিষাক্ত বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল। তিনি সাহস করিয়া নিজ শরীরে ঐ গ্যাসের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্ত ঐ গ্যাস শ্বসিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি যেন অমরাবতীতে সুখে বিচরণ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে খুব হাসিতে ছিলেন। খানিক পরে তিনি সুস্থাবস্থায় আবার উঠিয়া বসিলেন—তখন শরীরে আর কিছুমাত্র গ্লানি নাই। সেই অবধি এই গ্যাস “হাস্তোদ্দাপক গ্যাস” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই অদ্ভুত গ্যাসের স্বরূপ আবিষ্কারের পর ডেভীর নাম বৈজ্ঞানিক সমাজে পরিচিত হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রয়েল ইনষ্টিটিউশন্ স্থাপিত হয় এবং কাউন্ট রুমফোর্ড (Count Rumford) তাঁহাকে ঐখানে সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি দিন দিন নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তড়িতের সাহায্যে কষ্টিক পটাশ (caustic potash) এবং কষ্টিক সোডা (caustic soda) নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্রব্যকে বিস্ফোট করিয়া পোটাসিয়াম (potassium) এবং সোডিয়াম (Sodium) নামক দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। ঐ উপায়ে মেগ্নিসিয়াম (magnesium) বেরিয়াম (barium) কেলসিয়াম (calcium) ও স্ট্রন্সিয়াম (strontium) নামক

আরও চারিটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করেন। কিন্তু এক হিসাবে তাঁহার সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সেফ্টি ল্যাম্প (safety lamp)। পূর্বে কয়লার খনিতে নানাপ্রকার দাহ্য গ্যাস থাকতে তথায় কোনরূপ আলোক লইয়া যাওয়া বিপদজনক ছিল। ডেভী তাঁহার নূতন প্রদীপ আবিষ্কার করিয়া খনির কার্যে নিযুক্ত সহস্র সহস্র মানবের প্রাণরক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ডেভীর বক্তৃতা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জ্ঞাত দলে দলে পুরুষ ও মহিলা সমাগত হইতেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত অধ্যাপকগণের বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ আবিষ্কারের বিষয়ই বক্তৃতা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতনেরই আলোচনা হইয়া থাকে, নূতনের সন্ধান শ্রোতৃবর্গ পান না। এই পার্থক্যের ফল স্বভাবতই পৃথক্ হইয়া পড়ে। একদিকে যেমন কেবল চর্চ্চিতের চর্চণ, অধীতবিদ্যার অধ্যাপনা হইয়া থাকে, অপরদিকে নব নব তথ্য আবিষ্কারের জলন্তকাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণ শ্রোতৃবর্গের মনে নব অনুরাগ জাগাইয়া তোলে। একদিকে রাশি রাশি “পুস্তকস্থ বিদ্যার” কণ্ঠস্থকরণ ভিন্ন অগ্র সুফল দৃষ্ট হয় না, অপর দিকে বক্তার আদর্শের অনুকরণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্বতই শ্রোতৃবৃন্দকে আকুল করিয়া দেয়। ফ্যারাডে গ্যালারীর এককোণে বসিয়া একমনে ডেভীর স্বকীয় আবিষ্কারের ভাবভঙ্গিমাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে ডেভীর বৈজ্ঞানিক আদর্শ তাঁহার মনেও জাগিতে লাগিল। দণ্ডির কাজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। কেমন করিয়া তিনি দণ্ডির

কাজ ছাড়িয়া অতি দীনভাবেও বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারিবেন এখন হইতে সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনিবার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি প্রত্যেক বক্তৃতার জন্ত এক শিলিং খরচ করিয়াও ৪৩ নম্বর 'ডরসেট ষ্ট্রীটস্থ মিষ্টার টটমের বাটীতে রাত্রি আটটার সময় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। তাঁহার নিজের পয়সা ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা রবার্ট এই সকল বক্তৃতা শুনিবার খরচ দিতেন। তিনি এই সকল বক্তৃতা কেবল শ্রবণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তাহাদের সারমর্ম খাতায় লিখিয়া লইতেন এবং প্রদর্শিত যন্ত্রাদির চিত্রও অঙ্কিত করিতেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর তাঁহার রিবোর নিকট শিক্ষানবিশী শেষ হইল। তাহার পর তিনি নিজের নামে দপ্তরির ব্যবসা খুলিলেন। দিন কতক এইরূপে কাজ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার শিক্ষানবিশীর সময় বিজ্ঞানচর্চার জন্ত যতটা সময় পাইতেন এখন আর তাহা পান না। অতএব এখন হইতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক এই দপ্তরির কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। ইতিপূর্বে তিনি রয়েল সোসাইটি নামক ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভার সভাপতি সার জোসেফ ব্যাক্সস্কে স্বকীয় বিজ্ঞানচর্চার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তথায় একটি চাকরির জন্ত একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই দুঃসাহসের কি আর উত্তর দিবেন। এখন তিনি আবার সার হাম্ফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—“এই সময়ে আমার কর্ম্ম

পরিত্যাগ ও বিজ্ঞানের সেবা করিবার ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে আমি সাহসে ভর করিয়া সার হাম্ফ্রী ডেভীকে একখানি পত্র লিখিলাম। আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে আমার নিজের কৰ্ম্ম নীচ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সদাশয় ও মহৎব্যক্তি। ঐ পত্রে আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে যদি স্মৃতিধা হয় তাহা হইলে তিনি আমাকে একটি চাকরী দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। চিঠির সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা যে খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম তাহাও পাঠাইয়া দিলাম।” ডেভী ফ্যারাডের খাতাখানি পড়িয়া তাঁহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। ডেভী উত্তরে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

মহাশয়,

আপনি আমার উপর বিশ্বাসের যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে আমি আদৌ অসন্তুষ্ট নহি এবং আমি উহাতে আপনার ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রভূত স্মৃতিশক্তি ও মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি। আমি সম্প্রতি সহরের বাহিরে যাইতেছি এবং সহরে ফিরিতে নাগাদ জালুয়ারী মাস হইবে। ফিরিয়া আসিলে আপনি যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। আমি যথাসাধ্য আপনার উপকার করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। ইতি

ভবদীয়—হম্ফ্রী ডেভী।

ডেভীর এই উত্তরে ফ্যারাডের কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল এক দিবস রাত্রে ফ্যারাডে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময়ে বাটীর দরজায় জোরে ধাক্কার শব্দ পাইলেন। দরজা খুলিবামাত্র একজন ভূত্য একখানি পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া গেল। পত্রখানি

খুলিয়া দেখেন যে উহা ডেভীর লিখিত—রয়েল ইন্সটিটিউশনে একজন সহকারীর পদ খালি আছে, ফ্যারাডের মনের যদি পরিবর্তন না হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ পদ তাঁহার হইতে পারে। তিনি এইরূপে তাঁহার চিরইচ্ছিত বিজ্ঞানসেবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে ঐ পদের জ্ঞাত প্রার্থী হইলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ মাসের রয়েল ইন্সটিটিউশনের পরিচালকগণের সভার কার্যাবিবরণীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে “সার হামফ্রী ডেভী ইন্সটিটিউশনের পরিচালকগণকে জানাইয়াছেন যে তিনি এক ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি উইলিয়ম পেনের পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। ইহার নাম মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁহার বয়স বাইস বৎসর, তাঁহাকে সংস্কারবাসম্পন্ন, কৰ্ম্মঠ, প্রকল্পচিত্ত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। মিষ্টার পেন্ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সময় যে বেতন পাইতেন ইনি সেই বেতনেই কৰ্ম্ম করিতে রাজী আছেন।

অতএব স্থিরীকৃত হইল যে মাইকেল ফ্যারাডে মিষ্টার পেনের পদে সেই বেতনে নিযুক্ত হইলেন।”

“বাদৃশী ভাবনা যন্ত, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”—ফ্যারাডে এতদিন যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। তিনি সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং বেতনে রয়েল ইন্সটিটিউশনে সহকারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং থাকিবার জন্ত উপরতলায় দুইটি ঘরও পাইলেন।

ইউরোপ ভ্রমণ ।

ফ্যারাডে আগ্রহ সহকারে নিজের কর্তব্য কৰ্ম্ম করিতে লাগিলেন। ডেভী এই সময়ে নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নামক একটি

অতি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। একটু অসাবধান হইলে হয়ত যন্ত্র ফাটিয়া গিয়া প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, এক্ষেত্রে ডেভী ফ্যারাডেকে সহকারী করিয়া লওয়াতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি ফ্যারাডের দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইজনে কাচের বস্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া এই বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিতেন, এবং কোনও রূপ বিপদ না হওয়াতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ফ্যারাডে খুব সতর্কতা ও দক্ষতাসহকারে তাঁহার কর্তব্যকর্ম সমাধা করিয়াছিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডেভী ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন এবং ফ্যারাডেকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নানা দেশের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা, তাঁহাদের কার্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার সুবিধা, তাঁহাদের বিজ্ঞানাগার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ফ্যারাডে ছাড়িতে পারিলেন না। শুধু পুস্তক পাঠে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, তাই ইউরোপের কৃতী ছাত্রবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর সমস্ত ইউরোপের প্রথিত-যশা অধ্যাপকগণের বিজ্ঞানাগারে কয়েক বৎসর কাজ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া থাকেন। মহতের সংস্পর্শে যে পুণ্যের সঞ্চয় হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের কথাবার্তায় এবং কার্যপ্রণালীতে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি, একটা উত্তেজনার ভাব আছে, যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষার্থীও তদীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই ফ্যারাডের এই ইউরোপ ভ্রমণ প্রকৃত শিক্ষার কার্য করিয়াছিল।

যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ডেভীর সঙ্গে তাঁহার পত্নী, ফ্যারাডে ও একজন ভৃত্য যাইবার কথা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভৃত্যটি বাটী ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হইল। ফ্যারাডের ডেভীর সহকারীরূপেই যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সঙ্গে ভৃত্য না যাওয়াতে তাঁহাকে অনিচ্ছাসম্বন্ধে ভৃত্যের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত। ফ্যারাডে ইউরোপ ভ্রমণকালে একখানি খাতায় ভ্রমণসম্বন্ধে স্মরণীয় ঘটনাস্থলি লিখিয়া রাখিতেন। তাহা পাঠে জানা যায় যে ইয়োরোপপ্রবাস তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুখের হয় নাই। বিশেষতঃ ডেভীপত্নী তাঁহার উপর কর্তৃত্ব দেখাইবার জন্ত তাঁহাকে নানারূপ নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এ সকলই সহ্য করিয়া দেড় বৎসরকাল ইউরোপে নানা দেশদর্শন ও অনেক বৈজ্ঞানিকের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানব প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথমে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে অনেক ফরাসী বৈজ্ঞানিকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এক দিবস আর্মপ্যার, ক্লিমেণ্ট ও ডেসরনে নবাবিষ্কৃত “আইওডিন” নামক মৌলিক পদার্থ ডেভীকে দেখাইতে আনিয়াছিলেন। ডেভী প্যারিসে উহা লইয়া কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তথায় তিন মাস অতিবাহিত করিয়া সকলে ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের গাড়ী পঁয়ষট্টি জন বাহকের দ্বারা আল্পস পর্বতের উপর দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। প্রথমে সকলে টিউরিন সহরে পহঁছিলেন, সেখান হইতে জেনেভা যাত্রা করিলেন। জেনেভাতে চলনশীল তড়িতের (Current electricity) আবিষ্কর্তা বয়ঃ

ও. জ্ঞানবুদ্ধ ভল্টার (Volta) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এইখানে আর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডিলা রাইভের (De La Rive) সহিত ফ্যারাডের পরিচয় হয়। তিনি ফ্যারাডের গুণের এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন যে এক দিন ডেভী ও ফ্যারাডে উভয়কেই তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ডেভী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, কারণ ফ্যারাডে যখন কোন কোন বিষয়ে তাঁহার ভূতোর কার্য্য করিতেন তখন তাঁহার সহিত একসঙ্গে তিনি আহার করিতে পারেন না। ডিলা রাইভ এই উত্তরে দুঃখিত হইয়া বলিলেন “তাহা হইলে আমাকে একটি ভোজের পরিবর্তে দুইটি ভোজ দিতে হইবে”। ফ্যারাডে তাঁহার এই সৌজন্ত্য কখনও বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার স্মৃতি চিরজীবন তিনি বহন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ডিলা রাইভের পুত্রকে ফ্যারাডে লিখিয়াছিলেন “আপনার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তিনি স্বয়ং জেনেভাতে, এবং পরে চিঠিপত্রে আমাকে উৎসাহিত এমন কি সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন”।

জেনেভা হইতে ডেভী সদলে ফ্লরেন্স সহরে উপস্থিত হইলেন। এখানে ফ্যারাডে সর্বমুখে গ্যালিলিও (Galileo) কর্তৃক ব্যবহৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দেখিলেন। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে পুণ্যশ্লোক গ্যালিলিও নৈশগগনের তারকামণ্ডলীর সহিত রজনীতে সখাতা স্থাপন করিতেন। গ্যালিলিও বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচারের জন্ত রাজদ্বারে সর্বিশেষ নিগূহীত হইয়াছিলেন কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্র অতি সময়ে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন।

ফ্রেন্সে প্রায় এক মাসকাল অতিবাহিত করিয়া সকলে রোম নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে নেপল্‌স সহর দেখিয়া ভিস্ত্রভিয়াস নামক আশ্বেষগিরি দর্শন করিতে গেলেন। তাহার পরে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জেনেভাতে পহুছিলেন; তথা হইতে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ফ্যারাডে ফিরিয়া আসিয়া আবার রয়েল ইন্‌স্টিটিউশনে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত হাতে কলমে কাজ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ডেভীর স্থায় বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা অল্পে অল্পে তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বাস্তবিক উপযুক্ত গুরু লাভ না হইলে সাধনার পথ সুগম হয় না—তাই দেখি প্রফ্লাদের গুরু নারদ, শিবাজীর গুরু রামদাস, বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ, মাইকেলের গুরু মিল্টন, আর ফ্যারাডের গুরু ডেভী। এখন হইতে ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক জীবন আরম্ভ হইল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী তিনি “সিটি ফিলজফিক্যাল” সোসাইটিতে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেন। ঐ বৎসরই তাঁহার প্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতক্ষণ আমরা ফ্যারাডের প্রতিভা কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারই পরিচয় দিলাম। : তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া তাঁহার কথা শেষ করিব।

বিবিধ গ্যাসকে তরলীকরণ।

(Liquefaction of gases)

ফ্যারাডে একধারে রাসায়নিক ও পদার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে ১৮১৬ সালে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তত মূল্যবান নয়, উহাতে টস্কানীদেশজাত চুণের একটি নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৬ সাল হইতে ১৮২০ সাল পর্যন্ত—এই চারি বৎসরে—ফ্যারাডে সাঁইত্রিশখানি মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত ফ্যারাডে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাহা তখনও আরম্ভ হয় নাই।

অনেকে তরল বায়ুর (liquid air) কথা শুনিয়া থাকিবেন। এখানে আমরা চম্খচক্ষে এখনও তরল বায়ু দেখি নাই, কিন্তু বিলাতে তরল বায়ু বিজ্ঞানাগার সমূহে বোতল বোতল ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বায়ুকে খুব বেশী চাপ (pressure) দিলে ও প্রায়-২০০ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডা করিলে বায়ু জলের মত তরল হইয়া যায়। উহা এত ঠাণ্ডা যে এক ফোঁটা হাতে পড়িলে হাতে কোন্সকা উঠে। ফ্যারাডে অবশ্য তরল বায়ু আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু উহার প্রস্তুতপ্রণালীর পস্থা সূগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম নানাবিধ গ্যাসকে তরল করিবার পস্থা আবিষ্কার করেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে ক্লোরিন নামক গ্যাসকে তরল করিবার প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়। তিনি একটি কঁচনলের এক মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে ক্লোরিন

হাইড্রেট (chlorine hydrate) নামক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরে অপর মুখটি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যে মুখটিতে ক্লোরিন হাইড্রেট ছিল, সেই মুখে অল্প অল্প উত্তাপ প্রদান ও অপর মুখটি বরফে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে দেখিলেন যে, থালি মুখে খানিকটা পীত তৈলের মত তরল পদার্থ জমিয়াছে। তাঁহার আগে নর্থমোর নামে একজন রাসায়নিক এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্যারাডে এই তরল পদার্থের স্বরূপ সম্যক অবধারিত করিয়াছিলেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেন যে, এই তরল পদার্থ তরলীভূত ক্লোরিন গ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ পরীক্ষায় তিনি দেখিতে পাইলেন যে কোনও গ্যাসকে তরলীভূত করিবার জন্ত দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন—(১) অত্যধিক চাপ ও (২) অত্যধিক ঠাণ্ডা। বদ্ধ কাচনলের ভিতর ক্লোরিন হাইড্রেট উত্তপ্ত হওয়ার সময় প্রথমে ক্লোরিন গ্যাস বহির্গত হয়, কিন্তু উহা বাহির হইতে না পারায় স্বতই প্রভূত চাপ উৎপাদন করে এবং বরফের দ্বারা ঠাণ্ডা করায় উক্ত তরল আকারে পরিণত হইয়া থাকে।

ক্রমে এইরূপ উপায়ে তিনি আরও অনেকগুলি গ্যাস তরল করিয়া ফেলেন—সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide) এমোনিয়া, (Ammonia) সাইয়ানোজেন (Cyanogen) প্রভৃতি। কিছুকাল পরে ফ্যারাডে একটি ছোট পম্পের সাহায্যে চাপ বৃদ্ধি করিয়া ও বরফের সহিত লবণ ও অজ্ঞাত দ্রব্য মिलाইয়া শীতলতা বৃদ্ধি করিয়া কার্বনিক এসিড গ্যাস (Carbonic acid gas), হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস (Hydrochloric acid gas) ও নাইট্রাস গ্যাস (nitrous oxide)

তরল অবস্থায় আনিতে সক্ষম হইলেন। এইরূপে সেই সময়ে জানিত প্রায় তাবৎ গ্যাসই ফ্যারাডের হস্তে তরলতা প্রাপ্ত হইল। বাকি রহিল কেবল ছয়টি গ্যাস—অক্সিজেন, উদ্‌জান, নেত্রজান, কার্বন মনক্সাইড (Carbon monoxide), মার্শ গ্যাস (marsh gas) এবং নাইট্রিক অক্সাইড (nitric oxide)। অনেক দিবস পর্যন্ত কেহই এই কয়েকটি গ্যাসকে তরল করিতে সক্ষম হন নাই এবং উহারা “চিরস্থায়ী গ্যাস” (permanent gas) নামে অভিহিত হইত। যে কার্য ফ্যারাডে আরম্ভ করিয়াছিলেন বহুদিন পরে তাহার সমাপ্তি হইয়াছে। এখন চাপ ও ঠাণ্ডা বৃদ্ধি করিবার জন্ত বড় বড় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যে এই “চিরস্থায়ী গ্যাস”গুলিও তরলীভূত হইয়াছে। পিক্টে, ক্যালিটে, রোল্লাস্কি, ওলসেস্কি, ডেয়োয়ার, লিগে, হ্যামসন প্রভৃতি ইংরাজ, ফরাসী, রুশীয় ও আমেরিকান রাসায়নিক-গণের জীবনব্যাপী চেষ্টায় ফ্যারাডের আরম্ভ কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বেঞ্জিন আবিষ্কার।

ফ্যারাডের অন্ততম রাসায়নিক আবিষ্কার—বেঞ্জিন (benzene)। “পোরটেবল গ্যাস কোম্পানী”র দ্বারা তৈল হইতে প্রস্তুত গ্যাস পরীক্ষা কালে তিনি এই তরল পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্র জানেন যে এই বেঞ্জিন হইতে জৈব (organic) রসায়নের এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরবর্তী কালে এই বেঞ্জিন হইতে অসংখ্য জৈব

পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাজারে আজ কাল পুন্থারাপি প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র বর্ণের যে শত শত রং পাওয়া যায় তাহার সকলগুলিই এই বেঞ্জিন হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত।



মাইকেল ফ্যারাডে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি। ফ্যারাডে যখন ক্লোরিন প্রভৃতি গ্যাসকে তরলীভূত করিতেছিলেন তখন তাঁহার কোন কোনও বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন “এ কাজে পৃথিবীর কি উপকার হইবে? যে কাজে পৃথিবীর কোনও

উপকার হইবে না, তাহাতে সময় নষ্ট করা উচিত নহে।” এরূপ প্রশ্ন এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে বিস্ফোরক রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা ঘাট, বাটি, ছাতা, জুতা, কাঁচ, কাগজ প্রভৃতি “প্রয়োজনীয়” দ্রব্য বাহাতে এদেশে উৎপন্ন হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত।

বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেন “ছেলে মানুষ করিয়া কি লাভ?” যাহারা এরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বিস্ফোরক রসায়ন বা পদার্থবিজ্ঞান উন্নতি না হইলে এই সকল “প্রয়োজনীয়” দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার আবিষ্কারের আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনেকটা নিষ্কান সাধনার মত। আরক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথিবীর কোন কাজে আসিবে কি না—এ চিন্তা করিবার অবসর বৈজ্ঞানিকের নাই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকের গবেষণার উপর পৃথিবীর তাবৎ “প্রয়োজনীয়” দ্রব্যের উৎপত্তি নির্ভর করিতেছে। ফ্যারাডে যখন এতটুকু তরল ক্লোরিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে তাঁহার প্রস্তুত তরল ক্লোরিন শত সহস্র বোতল স্বর্ণের খনিতে ব্যবহৃত হইবে? ফ্যারাডের দূরদৃষ্টি কখনও দোষিতে পায় নাই যে তাঁহার আবিষ্কৃত বেঞ্জিন হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচিত্র বর্ণের শত শত প্রকার রং প্রস্তুত করিবে। ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পাঠ করিয়া কে বলিতে পারিত যে তাঁহারই গবেষণার ফলস্বরূপ আজ বিশ্বে বিদ্যুৎ একটি পরমা শক্তিরূপে বিরাজ করিবে?

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আবিষ্কার ।

আজ বিদ্যুৎ যে সভ্যজগতে একটা প্রধান শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে, মানবের উন্নত বুদ্ধিকোশলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া আজ তড়িৎ “নিরন্তর ভূতভাবে” পাখা টানিতেছে, আলোক জালিতেছে, ট্রামগাড়ী চালাইতেছে, বড় বড় কল যন্ত্রাদি সবেগে ঘুরাইতেছে—বিদ্যুৎকে মানবের এত কাজে লাগাইবার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক আজীবন পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের স্থান খুব উচ্চে। তিনি এই সকল বৈজ্ঞাতিক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পরবর্ত্তীকালের বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল মূল সূত্র যন্ত্রনিৰ্ম্মাণকার্য্যে লাগাইয়া কত বিচিত্র যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। যখন বৈজ্ঞাতিক আলোকোদ্ভাসিত হুম্মা-রাজিমধ্যে বৈজ্ঞাতিক পাখাসঞ্চালিত বায়ু সেবনে স্নুখানুভব করিবেন তখনই আপনারা একবার কামারসন্তান মাইকেল ফ্যারাডেকে স্মরণ করিবেন—তিনিই যাবতীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিৰ্ম্মাণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়া আপনাদের চিন্ত-বিনোদনের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ফ্যারাডে যখন দপ্তরির কাজ করিতেছিলেন, তখন হইতেই তিনি বিদ্যুৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেন। সাত খণ্ড দস্তা ও সাতখানি আধপেনী লইয়া তাহাদের মধ্যে লবণের জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়া তিনি ভল্টার বৈজ্ঞাতিক ঘট (Voltaic pile) প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করিতেন। রয়েল ইনস্টিটিউশনে ডেভার সহিত তিনি বৈজ্ঞাতিক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বহুবিধ

অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহার জীবনের একমাত্র সার সম্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার বৈজ্ঞাতিক সমস্ত আবিষ্কারের পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব মাত্র।

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন।

(Induction.)

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে একটা বনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা ফ্যারাডের পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অষ্টাউ ও আমপিয়ার অনেক পরীক্ষা করিয়া বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে যে বনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ফ্যারাডের পূর্বে জানা ছিল যে একটা লৌহ শলাকার উপর তামার তার জড়াইয়া সেই তারের ভিতর তড়িৎ প্রবাহ (electric current) চালনা করিলে লৌহটি চুম্বকে পরিণত হয়। সেইরূপ বৈজ্ঞাতিক প্রবাহসংযুক্ত একটি তামার তারের নিকটস্থ অপর একটি তামার তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করা যায় কি না ফ্যারাডে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দশ দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে প্রায় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ফ্যারাডে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রথম। ফ্যারাডে রেশমের সূতার দ্বারা জড়ান তামার তার জড়াইয়া সূতার কাটিমের মত একটা বেষ্টন (coil) প্রস্তুত করিলেন। তারের দুইটি মুখে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করিবার জন্ত একটি বৈজ্ঞাতিক কোষের (electric cell) সহিত যুক্ত করিয়া

দিলেন। পূর্বেক্ত তারের কাটনের উপর আর একটি তারের বেঠেন প্রস্তুত করিয়া উহার দুইট মুখ একটি বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের (galvanometer) সহিত লাগাইয়া দিলেন। তাহার পর ভিতরকার বেঠনের মধ্যে যেমন তড়িৎ প্রবাহ চালাইয়া দিলেন অমনি বাহিরের বেঠনের ভিতর বিপরীত দিকে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। আবার যখনই ভিতরকার বেঠনের তড়িৎ প্রবাহ থামাইয়া দিলেন তখনই বাহিরকার বেঠনের ভিতর দিয়া আর একটি তড়িৎ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। এবারকার প্রবাহ প্রথম প্রবাহের বিপরীত দিকে। বিদ্যুৎশক্তিপরিমাপক যন্ত্রের লোহশলাকার গতির দ্বারা প্রবাহের দিক নির্ণীত হইয়া থাকে। ভিতরকার বেঠনের মধ্যে ঠিক যে সময়ে তার খুলিয়া বা লাগাইয়া তড়িৎ প্রবাহ থামান বা চালান হয়, ঠিক সেই সময়েই বাহিরকার বেঠনে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ভিতরকার বেঠনের মধ্যে যখন অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকে তখন বাহিরের বেঠনে তড়িৎ প্রবাহ চলে না।

দ্বিতীয়। বাহিরের বেঠনের মত আর একটি বেঠন প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর একখানা চুম্বকশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। চুম্বক প্রবেশ করাইবা মাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বেঠনে প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাইলেন। যতক্ষণ চুম্বক ভিতরে স্থির ছিল ততক্ষণ কোনও প্রবাহ লক্ষিত হইল না। আবার যখন চুম্বকশলাকাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া লওয়া হইল তখনই অপর দিকে আর একটি প্রবাহ বেঠনে প্রবাহিত হইল। এইরূপে ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও চুম্বক উভয়ের দ্বারাই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন।

তৃতীয়। ফ্যারাডে ইহাতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি

জানিতেন যে পৃথিবী একটি অতি বৃহৎ চুম্বকের কার্য করে, সেইজন্য সাধারণ চুম্বকের মুখ সতত উত্তর দিকে থাকে। তিনি ভাবিলেন যে যখন সাধারণ চুম্বক হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তখন পৃথিবী হইতেই বা কেন বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না? সেইজন্য তিনি একটা তামার তারের বেটন চুম্বকীয় স্ফটিকতনের (magnetic dip) ক্ষেত্রে রাখিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ-শক্তিপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে বেটনটি ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বারেই একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বেটনের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চতুর্থ। ফ্যারাডে আরও দেখাইলেন যে কেবল একটা তড়িৎ প্রবাহ নিকটবর্তী অপর একটি তামার তারে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে এমন নহে, যে তারের ভিতর দিয়া সেই প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে সেই তারেই একবার খুলিবার সময় ও একবার দিবার সময় দুইটি তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রবাহের নাম দিলেন “এক্সট্রা কেরেন্ট” (extra current)।

ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎজননের কতকগুলি নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল। তাঁহার পূর্বে বিদ্যুৎকোষের (electric cell) দ্বারাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইত, কিন্তু সেই সকল কোষে যে মূল্যবান দ্রব্যসকল ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি দিনকতকের পর ফেলিয়া দেওয়া হইত বলিয়া বিদ্যুৎজনন অত্যন্ত মহার্ঘ ছিল। ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারকে মূল স্ত্র করিয়া অধুনা বৃহৎ বৃহৎ ডাইনামো প্রভৃতি বিদ্যুৎজননের যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে এবং এই সকল যন্ত্রজাত বিদ্যুতের সাহায্যে আলোক জলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, ট্রাম ও কল চলিতেছে।

বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিয়ম ।

(Law of Electrolysis.)

বিদ্যুতের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে তাহা ফ্যারাডে পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নিকলসন এবং কার্লাইল নামক দুই ব্যক্তি তড়িতপ্রবাহের দ্বারা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উদ্ভ্জান ও অক্সিজান গ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ডেভী তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা কষ্টিক, সোডা ও পটাস নামক তীক্ষ্ণ ক্ষারদ্রব্য বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটি নূতন ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতর তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিয়া বিবিধ পরীক্ষার পর একটি পরিমাণাত্মক নিয়ম (quantitative law) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহের দ্বারা ১ ভাগ ওজনের উদ্ভ্জান, ৮ ভাগ অক্সিজান, ৩৫.৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩.৫ ভাগ সীসক, ১০৮ ভাগ রৌপ্য, ও ৬৫.৩ ভাগ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে যে এই ৮ ভাগ অক্সিজান, ৩৫.৫ ভাগ ক্লোরিন, ১০৩.৫ ভাগ সীসক প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ ১ ভাগ ওজনের উদ্ভ্জানের সহিত রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক সংযোগের ওজনকে “তুল্য ওজন” (equivalent weight) বলে। সেইজন্ত ফ্যারাডে তাঁহার নিয়ম নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন—“সমপরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বিভিন্ন যৌগিক হইতে “তুল্য ওজনের” মূল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকে”। সোনা রূপার গিণ্টি করার আধুনিক প্রক্রিয়া বিদ্যুতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

চুম্বকত্ব ও পরাচুম্বকত্ব ।

(Paramagnetism and diamagnetism.)

ফ্যারাডের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার দ্রব্যসমূহের চুম্বকত্ব ও অচুম্বকত্ব। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে দেখাইলেন যে যাবতীয় দ্রব্য সাধারণ চুম্বকের দ্বারা হয় আকৃষ্ট (attracted) হয়, না হয় বিতাড়িত (repelled) হয়। তিনি কঠিন তরল ও বায়বীয় এই তিনি প্রকার দ্রব্য লইয়াই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে ধাতু সকলের মধ্যে লৌহ, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতু চুম্বকজাতীয় এবং দস্তা, টিন, পারদ, সীসক, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু পরাচুম্বক জাতীয়। ধাতু ভিন্ন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়—অনেক প্রকারের কাগজ, গালা, গ্রেফাইট, ফ্লুরস্পার, কাঠের কয়লা ইত্যাদি এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সাধারণ চুম্বকের দ্বারা বিতাড়িত (repelled) হয়—ফটকিরি, কাঁচ, চিনি, রুটি, গন্ধক ইত্যাদি। ফ্যারাডে তরল দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি দ্রব্যের জলীয় দ্রব (solution) চুম্বকাত্মক, যথা—লৌহ ও কোবাল্ট ধাতুর যৌগিকসমূহ। অপর দিকে জল, রক্ত, হৃৎ, স্নায়ু, তর্পিন, তৈল, ইথার প্রভৃতি তরল পদার্থ পরাচুম্বক-জাতীয়। তাহার পর তিনি বায়বীয় পদার্থের চুম্বকত্ব বা পরাচুম্বকত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে বাতির আলো চুম্বকের দ্বারা সজোরে বিতাড়িত হইয়া থাকে কিন্তু অল্পজান চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যাবতীয় দ্রব্যের চুম্বকত্ব বা পরাচুম্বকত্বের গুণ আবিষ্কার করিয়া ফ্যারাডে এক

নূতন শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। অল্পজ্ঞানের চুম্বকত্বের দরুণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া ফ্যারাডে প্রচার করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার নানাবিধ পরীক্ষা তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরীক্ষাকুশল বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

ফ্যারাডের আরও অনেক মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইয়াছে; বাহ্যিকভাবে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। বাস্তবিক এক নিউটন ভিন্ন অপর কোনও বৈজ্ঞানিক এতগুলি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন কি না সন্দেহের বিষয়। তিনি নিজে একখানি খাতা তৈয়ারি করিয়াছিলেন এবং সেই খাতায় যখন যে বিষয়ে কোনও প্রস্তাবনা মনে উদয় হইত তাহা লিখিয়া রাখিতেন। তিনি সকল বৈজ্ঞানিককে এইরূপ একখানি নোটবহি রাখিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সুবিধা অনেক আছে। অগ্ন হঠাৎ একটা বিষয়ে পরীক্ষা করিবার কথা মনে উদ্ভিত হইল, হয়ত কাজের ভিড়ে তাহা লিখিয়া না রাখার দরুণ ভুলিয়া যাইতে হইল। এইরূপ একখানি খাতা থাকিলে সেরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

তাঁহার শিক্ষাগুরু ডেভীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ক্রমেই কমেতে ছিল। ফ্যারাডে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা যতই খ্যাতি অর্জন করিতেছিলেন ততই ডেভী তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়—প্রথমে গুরুশিষ্যে বেশ হৃদয় থাকে, পরে যখন প্রতিভাশালী শিষ্য স্বীয় প্রতিভার গুণে গুরুর সমকক্ষ হইয়া উঠেন তখন গুরুর আর শিষ্যের প্রতি পূর্বভাব থাকে না; একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া দেখা দেয়।

এক্ষেত্রেও ডেভীর অবস্থা কতকটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। যখন ফ্যারাডের নাম বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সদস্যরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, তখন ডেভী উহার সভাপতিরূপে তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে দিবস ভোট লওয়া হইয়াছিল, ব্যালট বাক্সে একটিমাত্র কালো বল দেখা গিয়াছিল; অবশ্য এই কালো বলটি কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা ফ্যারাডের বুঝিতে বাকি ছিল না। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে কোনও বৈজ্ঞানিক জীবিতকালে স্বদেশ ও বিদেশ হইতে ফ্যারাডের মত এত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই—ফ্যারাডে সর্বসমেত পঁচানব্বইটি সম্মানসূচক পদবী ও খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।

ফ্যারাডের চরিত্র অতি পবিত্র এবং স্বভাব অতি মধুর ছিল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মিস সারা বার্ণাডকে বিবাহ করেন। বিবাহের আটাইশ বৎসর পরে তাঁহার খাতায় তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন “১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন আমি বিবাহ করিয়াছি—এই বিবাহ অশ্রু বিষয় অপেক্ষা আমাদের সমগ্রিক মানসিক আনন্দ ও পার্থিব সুখ প্রদান করিয়াছে। আমাদের বিবাহবন্ধন আজ আটাইশ বৎসর চলিয়া আসিয়াছে, ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের গাঢ়তা বৃদ্ধি ভিন্ন উহার কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই।” বিবাহের পর রয়েল ইনষ্টিটিউসনে আলাহিদা ঘর পাইয়াছিলেন; সেইখানেই সপরিবারে তিনি বাস করিতেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান সচিব সার রবার্ট পিল ফ্যারাডেকে ৩০০ পাউণ্ড বাৎসরিক পেন্সন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে প্রথমে উহা লইতে রাজি হন নাই, কারণ তিনি বলিতেন যে স্বীয় জীবিকা উপার্জনের ক্ষমতা তাঁহার

তখনও ছিল। শেষে বন্ধুবান্ধবদিগের উপরোধে তিনি রাজি হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পিলের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্বেই লর্ড মেলবোর্ন প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। নূতন সচিব ফ্যারাডের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ফ্যারাডে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। লর্ড মেলবোর্ন ফ্যারাডেকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই—ফ্যারাডের স্বভাব বালকের ছায়া সরল হইলেও তাঁহার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দৃঢ়তা যথেষ্ট ছিল। প্রধান সচিবের কথাবার্ত্তায় ফ্যারাডে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; লর্ড মেলবোর্ন কথাপ্রসঙ্গে খুব সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন যে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকগণকে পেন্সন প্রদান করার প্রথাকে তিনি অর্থের অপব্যয় মনে করেন। ফ্যারাডে বাটী আসিয়াই লর্ড মেলবোর্নকে একখানি পত্র লিখেন—তাহাতে তিনি সেদিনকার কথাবার্ত্তায় নিজের বিরক্তি জ্ঞাপন করেন এবং প্রস্তাবিত পেন্সন গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পরে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। ফ্যারাডে তাঁহাকে বলেন যে যদি লর্ড মেলবোর্ন তাঁহার কথাবার্ত্তার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন তাহা হইলে এ বিবাদ মিটিয়া যাইবে। লর্ড মেলবোর্ন এই সংবাদ পাইয়া আন্তরিক দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফ্যারাডেকে পত্র লিখেন এবং এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। ফ্যারাডে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পেন্সন ভোগ করেন। এই ঘটনায় ফ্যারাডের উন্নত মনুষ্যত্বের পরিচয় বেশ সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয়া মহামাতা সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স কনসার্টের অনুরোধে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া হামটন কোর্টে একখানি বাটী ফ্যারাডেকে বাস করিতে দেন।

এই বাটীতে তিনি জীবনের শেষকাল অতিবাহিত করেন। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর পূর্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ২৫এ আগষ্ট তারিখে সাতাত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পড়িবার ঘরে চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হন। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে বিনা আড়ম্বরে তাঁহার সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং একখানি সামান্য সমাধিফলকে তাঁহার শেষ বিশ্রাম স্থানের পরিচয় ঘোষিত হইতেছে। অথ এষ্ট উন্নতচেতা, বালকবৎ চিরসরল, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ ইংরাজের সমাধিফলকের উপর সুদূর বিদেশবাসী একজন ভক্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজেকে ধত্ত মনে করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

নিউটন ।

যেমন শিব নটকুলচূড়ামণি, যেমন পৰ্বতের মধ্যে হিনাদ্রি শ্রেষ্ঠ,
যেমন তারকাসুন্দরীগণের মধ্যে বোহিণী বরগীয়া, যেমন “কবিষ্ণু
কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ” তেমনই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে নিউটন সৰ্বশ্রেষ্ঠ।
শুধু ইংরাজ কেন, পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য জাতি একবাক্যে
নিউটনকে সৰ্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আসন প্রদান করিয়াছেন।
অথচ এই আত্মাভিমানশূন্য কণ্ঠবীর মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া গিয়াছিলেন
“আমি জানি না জগৎ আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কি মনে করিলে;
কিন্তু আমার নিজের মনে হয় যে আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া
ক্ষুদ্র বালকের তায় প্রস্তুতপণ্ড কুড়াইয়াছি মাত্র, আর বিশাল জ্ঞান-
সমুদ্র সমস্তই অনাবিকৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।”

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লিনকনশায়ারের মধ্যস্থ
উলম্‌থর্প নামক গ্রামে নিউটনের জন্ম হয়। যিনি এককালে বিশ্বের
‘আকর্ষণ’ আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইবেন, তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার
কালে এত ক্ষুদ্রকায় ছিলেন যে, তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন যে
তিনি তাঁহার সম্ভ্রানকে একটা বোতলের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে
পারিতেন। ভূমিষ্ঠ শিশু এতই দুর্বল ছিল যে দুইটী স্ত্রীলোক
তাঁহার জন্ত ভিন্ন গ্রামে ঔষধ আনিতে যাইবার কালে মনে করে
নাই যে তাঁহার ফিরিয়া আসিয়া শিশুটিকে জীবন্ত দেখিতে

পাইবে। যাহা হউক, বিধাতা পৃথিবীর হিতের জ্ঞান যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখিলেন।

নিউটনের জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে লালনপালন করেন। বাল্যকালে নিউটন নিজ গ্রামের সন্নিকটস্থ এক স্কুলে পড়িতেন। লেখাপড়ায় বালক নিউটনের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত না, এবং ক্লাসে তিনি সকলের নীচে থাকিতেন। তবে অল্প বালকেরা যখন খেলা করিয়া বেড়াইত তখন নিউটন স্বহস্তে ছোট ছোট খেলনা প্রস্তুত করিয়া তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। কখনও জলঘড়ি প্রস্তুত হইতেছে, কখনও একটা ইটরূপে ধরিয়া তাহার দ্বারা একটা ছোট কল চালান হইতেছে, আবার কখনও কখনও একটা ঘূড়ির লেজ্রে একটা কাগজের লণ্ঠন বাঁধিয়া দেওয়া হইত, যেন গ্রামের লোকেরা দিনের বেলায় তারা দেখিতে পায়! এইরূপ ক্রীড়াকৌতুকেই তাঁহার বেশী আগ্রহ দেখা যাইত। একদিন উপর ক্লাসের একটি বেশী বয়সের ছেলে তাঁহাকে একটা লাথি মারে; নিউটন তাহার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সহিত মারামারি করেন। এই মারামারিতে তাঁহারই জয় হয়। মারামারিতে জয় লাভ করার পর হইতে লেখাপড়ায়ও অপর বালকদিগকে জয় করিবার জ্ঞান তাঁহাকে সচেষ্ট দেখা যায়। ইহার পর হইতে নিউটন স্কুলের একজন ভাল ছেলে বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যখন তাঁহার বয়স পনের বৎসর তখন তাঁহার মাতা পুনরায় বিধবা হইয়া উলস্‌থর্পে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনেন এবং চাষবাসের তত্ত্বাবধান কার্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই

দেখা গেল যে, চাষবাসের তত্ত্বাবধান তাঁহার দ্বারা ভালরূপই হইতেছে! প্রায়ই দেখা যাইত যে তিনি চাষবাসের তত্ত্বাবধান ফেলিয়া কোন বেড়ার বা ঝোপের ধারে বসিয়া বসিয়া অঙ্ক কসিতেছেন বা ছোট ছোট কল প্রস্তুত করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার এক মামা তাঁহার মাকে বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেখান হইতে শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ট্রিনিটী কলেজে প্রেরিত হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করার পর হইতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত ধীশক্তি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। তিনি অনন্তমানে অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই সত্যার্থ যুবকগণকে ঐ বিদ্যায় ছাড়াইয়া গেলেন। কলেজের পঠদশাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। একুশ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দ্বিপদ-সিদ্ধান্ত (binomial theorem) আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং শীঘ্রই শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়া ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস্ (Differential calculus) নামক গণিতবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সকল আবিষ্কার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, উহা প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে আদৌ উদ্ভিত হয় নাই। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি, এ পাশ করিয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার পর বৎসর কেম্ব্রিজে প্লেগ হওয়াতে তিনি নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার ।

কেষিজ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব হইতেই নিউটন জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। জ্যোতিষের একটা প্রশ্ন তাঁহাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সর্বদাই মনে মনে ভাবিতেন “আচ্ছা! চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে কেন? গ্রহ উপগ্রহগণই বা সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? উহারা সোজা চলিয়া যায় না কেন? বৃত্তাকারে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? একটি গোল মার্কেলকে একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর গড়াইয়া দিলে উহা বাতাস বা ক্ষেত্রের ঘর্ষণজনিত কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হইলে বরাবর সোজাই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রহ উপগ্রহ সকল সোজা চলিয়া যায় না কেন? কোন শক্তি উহাদিগকে ঘুরাইতে থাকে?” তিনি ইহার কারণ কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপ মানসিক অবস্থা লইয়া প্লেগের বৎসরে তিনি স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। সেখানেও সেই চিন্তা। একদিন বাগানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সন্মুখস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একটি পক্ক আপেল ফল মাটিতে সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি উহা লক্ষ্য করিলেন, তখনই মনে মনে প্রশ্ন উঠিল, আপেল পড়ে কেন? মনে মনে তখনই উহার জবাবও মিলিল;—“পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে বলিয়াই আপেল মাটিতে পড়ে।” যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি সন্মুখস্থ কাষ্ঠখণ্ড দর্শনে, অথবা অন্ধকার গৃহমধ্যস্থ বন্দী অপ্রত্যাশিত ক্ষীণ জ্যোৎস্না দর্শনে, বেক্রপ পুলকিত হয়, নিউটনও এই অপ্রত্যাশিত মানসিক উত্তর পাইয়া সেইরূপ

আনন্দিত হইলেন। পৃথিবীর আকর্ষণ যে ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এমন নহে। নিউটনের ছয় শত বৎসর পূর্বে ভারতের বৈজ্ঞানিকগণের উজ্জ্বল ভাস্কর ভাস্করাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন :—

আকৃষ্টশক্তিঞ্চ মহী তয়া যৎ পশুং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।

আকৃষ্যতে তং পতন্তীং ভাতি সখে সমস্তাং ক পতন্তিঃ মে ॥

অর্থাৎ, “পৃথিবীর আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে; সেই শক্তির বলে শূন্যমার্গে প্রাক্ষিপ্ত গুরু বস্তু পুনরায় পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হয় বলিয়াই বস্তু সকল পতনশীল বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর চতুর্দিকের আকাশ সমান হওয়াতে পৃথিবী আর কোথায় পড়িবে?” অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ প্রাচীন কালে ভারতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ভারতবাসী গোরব করিতে পারেন।

নিউটন এই পৃথিবীর আকর্ষণকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া উহা বিশ্বের আকর্ষণের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাণাত্মক নিয়মও (quantitative law) আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জ্যোতিষশাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

নিউটন ভাবিলেন, যদি পৃথিবী ক্ষুদ্র আপেল ফলটিকে বা উল্কে প্রাক্ষিপ্ত বস্তুমাত্রকেই টানিতে পারে তবে উহা পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চন্দ্রকে আকর্ষণ করিবে না কেন? পৃথিবী যদি চন্দ্রকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জ্যোতিষ্ক সূর্য্য, পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রবর্গকে আকর্ষণ করিবে না কেন? নিউটন ক্রমশঃ স্থির করিলেন যে এই বিশ্বাকর্ষণই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে শূন্যমার্গে বৃত্তাকারে ঘুরাইতেছে। পাঠকবর্গকে নিউটনের সিদ্ধান্ত সহজেই বুঝান যাইতে পারে। একখণ্ড দড়িতে

একটা ঢিল বাঁধিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঢিলটা সোজা চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঘুরাইবার সময় হস্তসংলগ্ন দড়ির আকর্ষণে উহা বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে ঢিলটির উপর দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে—একটি শক্তির দ্বারা উহা সোজা চলিয়া যাইবার জ্ঞাত ব্যস্ত ও অপরটি অর্থাৎ হস্তের আকর্ষণ উহার সোজা গতিকে প্রতিনিয়ত ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপে ঢিলটি হস্তের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও হস্তের উপর পড়িতেছে না, বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। সেইরূপ চন্দ্র কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে গতিশীল; উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে বরাবর সোজা চলিয়া যাইত; কিন্তু পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেইরূপ এই আকর্ষণের জ্ঞাত সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া উহাকে কেন্দ্র করিয়া অপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।

এইরূপে নিউটন মানসপথে ভ্রাম্যমান অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতির রহস্যময় চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না; তিনি আকর্ষণের পরিমাণ জানিবার জ্ঞাত সচেষ্ট হইলেন। বিখ্যাত জ্যোতিষী কেপ্লার নিউটনের পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘবৃত্তাকারে (ellipse) চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভ্রমণকালে গ্রহগণ সূর্য্যের নিকটস্থ হইলে বা সূর্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিলে আকর্ষণের কিরূপ বিভিন্নতা হয় তাহা নিউটন গণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ গণনার ফলে দেখিতে পাইলেন যে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যতই দূরে

যায়, সূর্যের আকর্ষণ ততই নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিতে থাকে। তিনি স্থির করিলেন যে এই আকর্ষণ, দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত ভাবে (inversely as the square of the distance) কমিতে থাকে ; যথা—দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয় আকর্ষণ চতুর্থাংশ হইয়া যাইবে, যদি তিনগুণ হয়, আকর্ষণ নবমাংশ হইবে ইত্যাদি।

বিশ্বের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই পরিমাণাত্মক নিয়ম আবিষ্কার



নিউটন।

করিয়া তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তাহা সপ্রমাণ করিবার জ্ঞাত চন্দ্রের গতি পৃথিবীর আকর্ষণের দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই গণনাতে পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পরিধি পর্য্যন্ত দূরত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু তৎকালে পৃথিবীর পরিধি বা ব্যাস সঠিক জানা ছিল না। যাহা জানা ছিল তাহা লইয়া তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গণনা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত চন্দ্রের গতি মিলিতেছে না ;— চন্দ্রের পরীক্ষিত গতি তাঁহার গণনা অপেক্ষা কিছু বেশী হইয়াছে। তিনি এই অসামঞ্জস্য মিলাইতে না পারিয়া, কাগজ পত্র সমস্ত দেবাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন নাই বা কাহাকেও সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একদিন রয়েল সোসাইটির অধিবেশনে পিকার্ড নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি সঠিকভাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্ধারিত পরিধি প্রচলিত মাপ হইতে কিছু বেশী হইয়াছিল। নিউটন এই সংবাদ প্রথমে পান নাই। কয়েক বৎসর পরে এই সংবাদ পাইয়াই তিনি বাটী গিয়া পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিয়া আবার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার ঠিক মিলিয়া গেল। কথিত আছে যে, যখন তিনি অঙ্ক কসিতে কসিতে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার গণনা মিলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে তখন তিনি আনন্দে এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গণনার শেষ ফল তিনি একজন বন্ধুকে কসিয়া দিবার জ্ঞাত

অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার স্মদীর্ঘ-কালব্যাপী সাধনা সফল হইয়াছিল ;—তিনি অনন্ত জ্যোতিষনগলীর গতির কারণ সঠিকরূপে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

“প্রিন্সিপিয়া” গ্রন্থ ।

ইহার পর হইতে তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া অনন্তমনে বিশ্বাকর্ষণ-সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার গবেষণার ফল জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ “প্রিন্সিপিয়া” নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় চিন্তায় এমনই নিমগ্ন থাকিতেন যে স্নানাহারের কথা অনেক দিন ভুলিয়াই বাইতেন। একদিন তাঁহার এক বন্ধু—ডাক্তার ষ্টকলে তাঁহার সন্নিবেশিত দেখা করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে একটি টেবিলে নিউটনের জ্ঞাত খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে ; ডাক্তারটি কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ভোজন সমাপ্ত করিয়া মুরগীর হাড়গুলি প্লেটে রাখিয়া দিয়া খাবার যেমন ঢাকা ছিল সেইরূপ ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলেন ; তারপর নিউটন আসিয়া বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে আহার করিতে বসিলে প্লেট খুলিয়া বিন্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—“ঔ্যাঃ ! আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি এখনও খাই নাই বুঝি, এখন দেখিতেছি আমার খাওয়া হইয়া গিয়াছে ত।” এইরূপ একাগ্রতা, এইরূপ অধ্যবসায় না থাকিলে “প্রিন্সিপিয়ার” জ্ঞান অমূল্য গ্রন্থ কখনও রচিত হইতে পারিত না। নবাবিস্কৃত বিশ্বাকর্ষণের সিদ্ধান্ত হইতে বহু নূতন তথ্য অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

ইংরাজের পরম ছুঁভাগ্য যে জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইংরাজ কর্তৃক লিখিত হইলেও ইংরাজি ভাষায় লিখিত হয় নাই—তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ল্যাটিনভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যখন এই মহাগ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইল তখনও উহা প্রকাশ করিবার করুনা নিউটনের মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় নাই। তিনি প্রকৃত জ্ঞানেরই উপাসক ছিলেন, নামের উপাসক ছিলেন না। তাই তিনি লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি একটা দেবাজে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন; ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ উহা প্রকাশ করিবে। কিন্তু ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালে প্রিন্সিপিয়ার পাণ্ডুলিপি নিউটনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন। যখন উহা প্রকাশিত হইয়াছিল তখন বৈজ্ঞানিক সমাজে দশ বার জন লোকও উহা সন্ধ্যা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সিপিয়ার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়, এই সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান। এস্থলে এই মহাগ্রন্থের প্রতিপাত্ত বিষয়গুলি সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব, সেইজন্য নিম্নে গুটিকতক বিষয়ের চুম্বকমাত্র প্রদত্ত হইল।

বিশ্বাকর্ষণের নিয়ম।—জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণ-শক্তি প্রত্যেক অণুর ভার অনুযায়ী ও দূরত্বের বর্গফলের বিপরীতানুযায়ী (*varies directly as the mass and inversely as the square of the distance*).

গতি নিয়মাবলী। (*Laws of motion*)—
গেলিলিও গতিশীল বস্তু সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম পরীক্ষার দ্বারা

আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নিউটন সেগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং তাহাদের বিশদ ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই সকল নিয়মের সাহায্যে পতনশীল দ্রব্যের গতির নিয়ম গণনা করেন এবং তাহাদের পথের স্বরূপও নির্ণয় করেন।

কেপ্লারের আবিষ্কৃত নিয়মাবলী।—কেপ্লার জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতি সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন নিউটন সেইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং তাহা হইতে বিশ্বাকর্ষণের দূরত্বমূলক নিয়ম ও অত্যাশ্চর্য্য কয়েকটি নিয়ম আবিষ্কার করেন।

দ্রব্যের ওজন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আক্ৰেপিক গুরুত্ব। তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে বিশ্বাকর্ষণই দ্রব্যসমূহের ওজনের কারণ এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি পৃথিবী অপেক্ষা কতগুণ গুরু বা লঘু তাহাও তিনি নির্ণয় করেন, যথা চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ত্রিশাংশ গুণ লঘু এবং সূর্য্য ৩১৬০০০ গুণ ভারী।

জোয়ার ভাটার কারণ।—তিনি দেখাইয়াছেন যে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের জন্তই সমুদ্রে জোয়ার ভাটা খেলে; এবং জোয়ার ভাটার পরিমাণও তিনি গণনা করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর আকার।—তিনি কেবলমাত্র গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ঠিক গোলাকার নহে, উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা এবং কতটা চাপা তাহাও সঠিক নির্ণয় করেন। তিনি দেখাইলেন যে ভূমধ্য-রেখা-ব্যাস মেরু-রেখা-ব্যাস অপেক্ষা ২৮ মাইল বড়।

গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ জনিত তাহাদের গতির বিকৃতি।—তিনি দেখিলেন যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল সূর্য্যের দ্বারা

আকৃষ্ট হয় না, অত্যাচ্ছ গ্রহের দ্বারাও হইয়া থাকে, সেই জন্ম উহাদের গতির বিবিধ বিকৃতি সাধিত হইয়া থাকে। তিনি এই সকল ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন ও তাহাদের পরিমাণও নির্ধারণ করেন।

ধূমকেতু।—তিনি দেখাইলেন যে অনিশ্চিত ধূমকেতুও বিশ্বাকর্ষণের অধীন এবং তাহারা পরবলয় (parabola) আকারে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া থাকে। তাহাদের পুনরাগমনের কালও গণনা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত এই সকল তথ্য ভিন্ন বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা ও গণনা এই মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি গ্রহের শেষভাগে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ও গতির অনন্ত সৌন্দর্য্য নানসপটে নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিন্দ্ৰমন্তকে জগতঃস্রষ্টার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণকে বুঝাইতে হইবে না যে এই বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এক সম্পূর্ণ অভিনব শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন আর গ্রহজ্যোতিষ্কবর্গ মানবনেত্রের সম্মুখে লক্ষ্যহীন বস্তুর ত্রায় বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিতেছে না, উহারা পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া একটি সম্পূর্ণ সমষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বিশ্বাকর্ষণ ও প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের আলোচনা করিতে গিয়া নিউটনের জীবন ষাটটি ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই। আমরা ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগের বৎসরে তাঁহাকে স্বগ্রামের বাটীর বাগানে বসিয়া বৃক্ষ-পতিত আপেল ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে কলেজে পড়িতেন

সেই কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ছই বৎসর পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত লিউকেশিয়ান-অধ্যাপক-পদে ডাক্তার ব্যারোর স্থানে নিযুক্ত হন। ডাক্তার ব্যারো অবসর গ্রহণ করিবার সময়, অঙ্কশাস্ত্রে নিউটনের অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়া, নিজেই তাঁহার নিয়োগের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিউটন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তাঁহার বর্ষ পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিলে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত রয়েল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে তিনি পার্লামেন্ট মহাসভার একজন সভ্যরূপে নির্বাচিত হন এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে টাকশালের কর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বাবজীবন তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সূর্যালোক বিক্লেষণ।

(Dispersion of Sunlight)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৬৬ সাল হইতে ১৬৭২ বা তাহার কিছুকাল পর পর্যন্ত নিউটনের বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা বন্ধ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া এই কয় বৎসর তিনি যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ সময় তিনি আলোকশাস্ত্রে (optics) মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং আলোক সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া

গিয়াছেন যে, যে বিষয়ে গবেষণা করিতে হইবে সেই বিষয়ে একেবারে অনশ্রুত হইতে না পারিলে আশামুরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে না। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতা সহকারে আলোকশাস্ত্রের কয়েকটি আবিষ্কার লইয়া এই কয় বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়াছেন ত? কিন্তু ঐ বিচিত্র বর্ণ কেমন করিয়া হয়? সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এনটনিও ডমিনিস নামক একজন ইটালিয় ধর্মযাজক সর্বপ্রথমে রামধনুর বর্ণের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ জলবিন্দুর উপর প্রতিভাত হইয়া রামধনুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহার পর ডেকার্টে দেখাইয়াছিলেন যে সূর্য্যকিরণ একটি ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া বাইলে রামধনুর ছায়া বিচিত্র বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু নিউটনের পূর্বে কেহই স্থির করিতে পারেন নাই যে কেন এবং কিরূপে এইরূপ বিচিত্র বর্ণের উদ্ভব হইয়া থাকে।

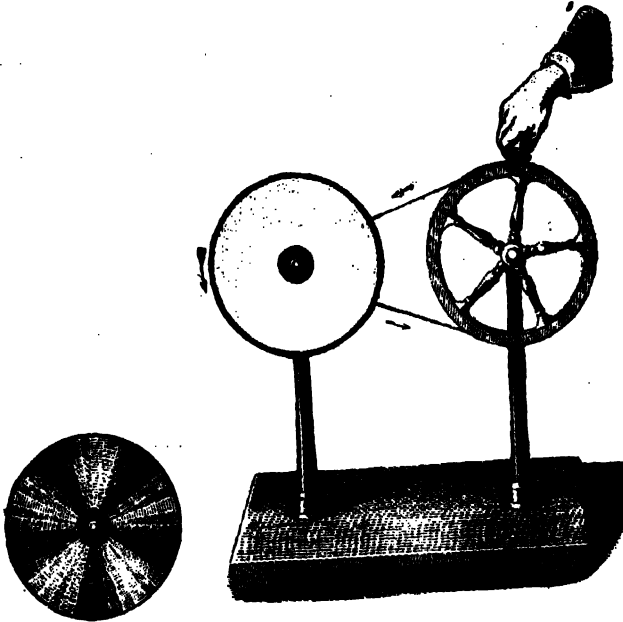
নিউটন একটি অন্ধকার ঘরের জানলায় একটি গোল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি আনয়ন করিয়া একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দেখিলেন যে অপর দিকস্থ একটি পর্দার উপর একটি লম্বা রামধনুর বিচিত্র বর্ণশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র (spectrum) শোভা পাইতেছে। সেই বর্ণচ্ছত্রে তিনি সাতটি রং উপরি উপরি দেখিতে পাইলেন—সর্বনিম্নে লাল, তাহার উপরে কমলালেবুর রং, তাহার উপর হরিদ্রার রং, সবুজ রং, নীল রং, পাত্‌ নীল, সর্বোপরি বেগুনে রং। বাস্তবিক বর্ণচ্ছত্র যে ঠিক সাতটি রঙের সমন্বয় তাহা নহে—অসংখ্য রং উহাতে আছে,

তবে সাতটি রং বেশ ধরা যায়। এখন নিউটনের জিজ্ঞাস্তা হইল দুইটি বিষয়—প্রথম, এই বিচিত্র বর্ণছত্র সূর্যের স্বেত আলোক হইতে কিরূপে আসিল? এবং দ্বিতীয়, বর্ণছত্র গোল না হইয়া লম্বা হইল কেন? এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্ত তিনি বর্ণছত্রের প্রত্যেক রং এক একটি করিয়া অপর একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্য প্রেরণ করিয়া উহা আর একটি পর্দায় ধরিলেন। তাহাতে তিনি দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন—প্রথম, এই সাতটি রঙের কোনটিও ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া গিয়া আর ভাঙ্গিয়া অল্প রঙ্গে পরিণত হইতেছে না, লাল রং লালই থাকিয়া যাইতেছে, বেগুনে রং বেগুনেই থাকিতেছে। দ্বিতীয়—যে রংটি বর্ণছত্রে যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, এখনও উহা ঠিক পর পর সেই স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি তাঁহার দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর পাইলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্থির করিলেন যে যখন লাল প্রভৃতি সাতটি রং বিস্পষ্ট হইয়া অল্প রঙ্গে পরিবর্তিত হইতেছে না, তখন উহারা আদি রং (primitive colours) এবং সূর্যের স্বেত আলোক এই সাতটি আদি রঙের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় স্বেত আলোক বিস্পষ্ট হইয়া সাতটি আদি রঙ্গে পরিণত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নেরও উত্তর মিলিল—তিনি দেখিতে পাইলেন যে সাতটি রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়া (refracted) যায়;—লাল রং সর্বাপেক্ষা কম বাঁকিয়া থাকে আর বেগুনে রং সর্বাপেক্ষা বেশী বাঁকিয়া যায় এবং অল্প অল্প রংগুলি এই দুই রংএর মাঝামাঝি পরিমাণে বাঁকিয়া থাকে।

সেই জন্তেই বর্ণছত্রে লাল রং সর্বনিম্নে থাকে এবং বেগুনে রং সকলের উপরে থাকে আর অপর রংগুলি এই ছয়ের মাঝামাঝি থাকে। এইরূপে রংগুলির জন্তে বিভিন্ন স্থানের সংকুলান করিতে গিয়া বর্ণছত্র লম্বা হইয়া পড়ে।

এই সকল পরীক্ষার দ্বারা নিউটন ছইটি বিষয় আবিষ্কার করিলেন—প্রথম, সূর্যালোক আদি রং নহে, উহা সাতটি রঙ্গের সমষ্টি বা সংমিশ্রণ; দ্বিতীয় প্রত্যেক রং ত্রিশিরা কাচের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বিভিন্ন ভাবে বাঁকিয়া যায়। নিউটন শুধু স্বেতালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সাতটি আদি রং মিলাইয়া স্বেত রং প্রস্তুত করিয়াও গিয়াছেন। একখানি কার্ডবোর্ডের বড় চাকৃতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে পূর্বোক্ত সাত রঙ্গের কালি দিয়া সমান করিয়া পাঁচটি বর্ণছত্র আঁকিলেন, তাহার পর এই চাকতিখানি একটি ঘোরাইবার যন্ত্রের উপর রাখিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে লাগিলেন; ঘুরাইবার সময় সাতটি রং এক সঙ্গে চক্ষুতে প্রতিভাত হইবার দৃশ্য একত্র মিলিত হওয়াতে সাদা বা স্বেত ধূসরবর্ণের সাদা দেখাইতে লাগিল। একেবারে সাদা না দেখাইবার কারণ আর কিছুই নয়—সকল কালির রং বর্ণছত্রের সাতটি রঙ্গের ঠিক অনুরূপ হয় না।

নিউটন স্বেত আলোকের স্বরূপ আবিষ্কার করিয়া রঙ্গের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন জ্যোতির রং দ্রব্য নাই, উহা আলোকে আছে। লাল দ্রব্য যে লাল দেখায়—তাহার কারণ এই যে, ঐ দ্রব্য লাল ব্যতীত অন্তরঙ্গ রঙ্গের আলোক শোষণ করিয়া থাকে, কেবল লাল আলোক



সাতরঙ্গে রঞ্জিত কার্ডবোর্ডকে ঘুরাইয়া দ্রব্যবর্ণের দেখাইতেছে।

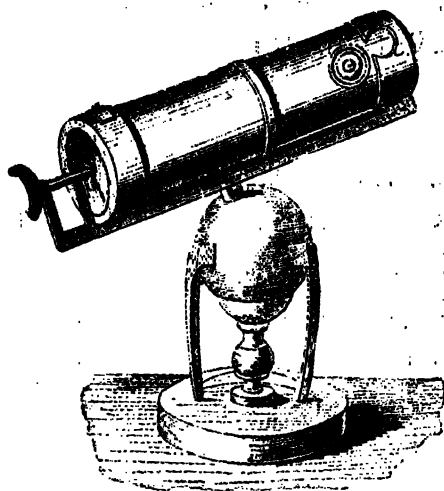
শোষণ করিতে পারে না। নীল কাচের মধ্যে দিয়া সূর্যালোক গাইলে সূর্যালোক নীল হইয়া যায়, তাহার কারণ নীল কাচ সূর্যালোকের আর সকল প্রকার রঙ্গের আলোককে শোষণ করিয়া ফেলিয়া কেবল নীল আলোককে যাইতে দেয়। নিউটনের এই অভিনব মত তখনকার প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অনেকে তাঁহার এই মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইলেন নাই।

“অপ্টিক্স” গ্রন্থ ।

নিউটন আলোক সম্বন্ধে আরও অনেক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আলোক সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার তাঁহার “অপ্টিক্স” (optics) নামক দ্বিতীয় মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি আর কিছু না করিয়া যদি কেবল এই গ্রন্থখানিই রচনা করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। এখানে এই সকল আবিষ্কারের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে দুই একটির উল্লেখ করা গেল মাত্র।

নূতন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার ।

সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গেলিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যন্ত্রে কাচ নির্মিত উন্নততর লেন্স (convex lens) ব্যবহৃত হইত বলিয়া পূর্বোক্ত বর্ণহীন ছবির চারিপাশে দেখা যাইত। তাহাতে ছবি অস্পষ্ট হইত। নিউটন কাচের লেন্স পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার উজ্জল ধাতুনির্মিত নতুনতর দর্পণ (concave metallic mirror) ব্যবহার করিলেন। এইরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে “পরাবর্তনীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র” (reflecting telescope) বলে এবং আধুনিক অনেক বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিউটনের আবিষ্কৃত যন্ত্রের অনুরাগী করিয়া নির্মিত হইয়া থাকে। তাঁহার নির্মিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েল সোসাইটীতে এখনও রক্ষিত আছে। উহার একখানি প্রতিকৃতি এখানে প্রদত্ত হইল।



নিউটনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

ষষ্ঠাংশ যন্ত্র—(Sextant)। আধুনিক নাবিকেরা ষষ্ঠাংশ যন্ত্র এখন যে আকারে ব্যবহার করেন তাহার আবিষ্কারী নিউটন।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে নিউটনের মত এই ছিল যে আলোকিত দ্রব্য হইতে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষে পতিত হয় বলিয়া আলোকের উদ্ভূত হয়। এই সিদ্ধান্তকে আলোকের “নির্গম সিদ্ধান্ত” (emission theory) বলে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের এই সিদ্ধান্ত এখন আর প্রচলিত নাই। এখন স্থির হইয়াছে যে ইথার (ether) বা

বোম নামক সৰ্বত্র বিদ্যমান অতি ক্ষুদ্র পদার্থের হিল্লোলে আলোকের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শব্দের গতি নির্ণয়।

আলোক সম্বন্ধে গবেষণা ব্যতীত শব্দ (sound) সম্বন্ধেও তাঁহার অনেক গবেষণা আছে। শব্দ সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণা তাঁহার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা বোম বা আকাশের (ether) শুণ শব্দবহন বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিয়াছে যে ইথার প্রকৃতপক্ষে শব্দবহন নহে, বায়ুই শব্দবহন। শব্দিত দ্রব্যের দ্বারা বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ উৎপত্ত হয় এবং সেই তরঙ্গ কর্ণপটাহে আবৃত করে বলিয়া আমরা শব্দ শুনিতে পাই। শব্দজনিত বায়ুর তরঙ্গ কিরূপে উৎপত্ত ও পতিত হয় নিউটন তাহা সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া যান এবং শব্দের গতিও (velocity) নির্ণয় করেন। তাঁহার গণনা একেবারে সঠিক না হইলেও তাহা প্রথম চেষ্টার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

নিউটনের সৰ্ব্বতোমুখী প্রতিভা শুধু জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাতে ক্ষান্ত হয় নাই, নিউটন রসায়নশাস্ত্রেও গবেষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রূথের বিষয় এই যে তাঁহার ডায়মণ্ড নামক কুকুর তাঁহার অল্পপস্থিতে একদিন একটা বাতি উল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়াতে সেই আশুনে তাঁহার রাসায়নিক গবেষণার পাণ্ডুলিপিগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এই ভ্রূটনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন “ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! তুমি জান না যে তুমি

স্বাক্ষর কি ক্ষতিই করিয়াছে।” এই দুর্ঘটনার পর তিনি আর কোনও বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিউটন আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অনেক সময় তাহা জনসমাজে প্রচারিত করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদ্ভিত হইত না। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, অনেক সময় তাঁহাকে স্বীয় আবিষ্কারের মৌলিকতা লইয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শূন্যবৃদ্ধি-সিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার বহু পরে অর্থাৎ ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবামাত্র বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক লাইবনিটজের সহিত উক্ত আবিষ্কারের পূর্বপর লইয়া তাঁহার বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক হইতে থাকে। যদি তিনি উক্ত আবিষ্কার সন্ময়ত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে লাইবনিটজের দাবী আদৌ উঠিত না। ফলে যে সময় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সময়ে জার্মানিতেও উহা লাইবনিটজ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আবার যখন “প্রিন্সিপিয়া” রচনার অনেক পরে উহা হালে কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখনও হুক নামক আর একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কারের ভাগ লইবার দাবী করিয়া বসিলেন। আসল কথা এই যে বিশ্বাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের আবিষ্কার যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়াতে হুক, রেন, হ্যালে প্রভৃতি অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণও ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমকালীন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকজগতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক চিরশান্তিপ্রিয় নিউটনকে

বড়ই মৰ্ম্মপীড়া দিত। তিনি একদা বলিয়াছিলেন “বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এমনই মোকদ্দমাপ্রিয় যে তাঁহার অনুচরবর্গকে তাঁহার সেবা করিতে হইলে বিলক্ষণ আইনজ্ঞও হইতে হইবে।” আর এক সময় তিনি লাইবনিটজকে লিখিয়াছিলেন “আমার আলোক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত লইয়া তর্কবিতর্কে আমি এত উত্থাপ্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আমার হৃৎক হয় যে একটা ছায়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া আমি আমার জীবনের সুখশান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।”

নিউটনের শেষজীবন স্বচ্ছন্দেই কাটিয়াছিল। তিনি টাকশালের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়া বাৎসরিক বারশত পাউণ্ড মাহিনা পাইতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইউরোপের সর্বত্রই সম্মানিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্ঞী আন ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, বোধ হয় বিবাহ করার কল্পনাও তাঁহার মনে কখনও উদ্ভিত হয় নাই। তাঁহার এক ভাগিনেয়ী ও তাঁহার স্বামী তাঁহার গৃহস্থালী রক্ষা করিতেন। তিনি চিরকাল ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাও করিতেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ তারিখে পঁচাশী বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। ওয়েষ্টমিনিস্টার এবীতে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হয় এবং ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার শবাধার বহন করেন। গেলিলিওর শোচনীয় পরিণাম ও তাঁহার প্রতি ইটালীবাসীগণের অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করিলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে হয় তেমনি নিউটনের প্রতি ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনে আনন্দ হয়।

নিউটনের আবিষ্কার কাহিনী সম্যক পাঠ করিলে স্বতই বিস্মিত হইতে হয় যে কেমন করিয়া এক ব্যক্তি এতগুলি আবিষ্কার

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে ষষ্ঠদশাতেই তিনি দ্বিপদ সিদ্ধান্ত (binomial theorem) ও শূন্যবৃদ্ধি স্নিদ্ধান্ত (theory of fluxions) আবিষ্কার এবং খেত আলোক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন দিক্‌দর্শন যন্ত্রের উন্নতিসাধন, বড়াংশযন্ত্র নির্মাণ, আলোক-সিদ্ধান্ত, রং সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, শব্দের গতিনির্ণয় প্রভৃতি বহুবিধ আবিষ্কার তিনি একাই করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারগুলি যদি দুইজন বৈজ্ঞানিক মিলিয়া করিতে পারিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই এক একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। কিন্তু সর্বোপরি যখন দেখিতে পাই যে এ সকল ভিন্ন তিনি বিশ্বাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জগৎ সৃজনের একটি গূঢ় রহস্য উৎঘাটন করিয়া গিয়াছেন, অনন্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর ব্যোমমার্গে অত্যদ্রুত ভ্রমণবৃত্তান্তনিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব উৎঘাটন করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে এক অভিনব সূত্রে গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তখনই তাঁহার অতিমানুষিক মানসিক শক্তির প্রাণরূপ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হই। এইরূপ একজন বিস্মিত ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিয়া গিয়াছেন “নিউটন কি আমাদের মত মানুষের ছায়া পানাহার করিতেন ও নিদ্রা বাইতেন? আমার নিকটে তিনি কিন্তু স্বর্গের দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন—যেন তিনি এই মরজগতের বাধাবাধির অতীত।” অথচ এই মহাপুরুষ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন “আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসিয়া পাথর কুড়াইয়াছি মাত্র, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র অনাবিকৃতভাবে আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে।” যিনি “মহতো মহীয়ান” তাঁহার জগৎসৃষ্টির অনন্ত রহস্যের মধ্যে যিনি ডুবিয়া বাইতে পারিয়াছিলেন এই কথা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

নাগার্জুন ।

যেমন নব্য রসায়নের জন্মদাতা বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভে'য়্যাসিয়ে, সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া যদি কোন একজনকে নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে নাগার্জুনকে নিঃসন্দেহে ভারতীয় রসায়নের জন্মদাতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । বহুবিধ তাত্ত্বিক গ্রন্থে নাগার্জুন তীর্থ্যকপাতন প্রক্রিয়া (Distillation) এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । এখানে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল । চক্রপাণি লৌহমারণ বর্ণনাকালে উহা নাগার্জুন কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । চক্রপাণি “নাগার্জুন বর্ত্তি” বর্ণনাকালে লিখিয়া গিয়াছেন “নাগার্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে” ; ঐ বর্ত্তির একটা উপাদান মারিত ভাস্কর । রসেন্দ্রচিস্তামনি নাগার্জুনকে তীর্থ্যকপাতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, “তীর্থ্যকপাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধনাগার্জুনাতিভিঃ” । চক্রপাণি লৌহমারণ নাগার্জুনের আবিষ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন— “নাগার্জুনো যুনীজ্জঃ শশাস চল্লোহশাস্ত্রমতিগহনম্ ।” নিত্যানাথ বিরচিত রসরত্নাকর নামক রসগ্রন্থে “ব্যাধিতানাং হিতার্থায় প্রোক্তং নাগার্জুনেন” যৎ এই শ্লোকে নাগার্জুনকে একজন

রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্বিন্ন, রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরাজলক্ষ্মী, রসকল্পসুধাকর প্রভৃতি বাবতীয় তাত্ত্বিক গ্রন্থে নাগার্জুন একজন প্রধান রসবিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। নাগার্জুন রসরত্নাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নাগার্জুনের আবির্ভাব কাল।

এই রাসায়নিক নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তনিতা সিদ্ধ নাগার্জুন একই ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রুতের টীকাকার ডব্বনাচার্যের মতে নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা। মহাযান প্রবর্তক নাগার্জুন যে একজন রাসায়নিক ও চিকিৎসাপারদর্শী ছিলেন সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ পালি, তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিখ্যাত চীন পর্যটক হুয়েন স্ভাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-পর্যটনে আসিয়াছিলেন। তিনি ভাতে আসিয়া নাগার্জুনকে একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ও রাসায়নিক বলিয়া শুনিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাগার্জুনের চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শীতা সম্বন্ধে বিস্তার অতিমাত্রাবিক কিঞ্চিদন্তী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বহু মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সমূহে নাগার্জুন একই কালে ধর্ম-প্রবর্তক ও রাসায়নিক বলিয়া বর্ণিত আছেন।

নাগার্জুনের আবির্ভাব কাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে।

যে সকল প্রমাণের দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম। চীন পর্য্যটক হুয়েন ত্সাং নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে নাগার্জ্জুনের জীবনী চীন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল।

তৃতীয়। হর্ষচরিতকার বান নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের সমসাময়িক করিয়াছেন।

চতুর্থ। রাজতরঙ্গিনীর মতে নাগার্জ্জুন কনিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন।

পঞ্চম। ডাক্তার রায় নাগার্জ্জুন কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ রস-রত্নাকর নামক গ্রন্থের যে অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে নাগার্জ্জুন, রাজা শালীবাহন, রত্নধোষ ও মণ্ডব্যোর সহিত কথোপকথন ছলে রসক্রিয়া বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ। মূল সংস্কৃত “মহালেক্ষা” নামক লুপ্ত পুস্তকের তিব্বতীয় ও চীন ভাষায় অনুবাদে নাগার্জ্জুনকে রাজা শতবাহনের বন্ধু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতিষী এলবেকনি মহম্মদ গজ্ঞবীর ভারত আক্রমণ কালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন নাগার্জ্জুনের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নাগার্জ্জুন সোমনাথের নিকট জন্মগ্রহণ করেন এবং রসায়নের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এলবেকনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ হুস্তাপ্য এবং তিনি এলবেকনির একশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রমাণগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অধিকাংশ প্রমাণ অনুসারে নাগার্জুন রাজা শতবাহনের সমসাময়িক ব্যক্তি। এই শতবাহন দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বংশের একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র বংশ খৃষ্টপূর্ব ৭৩ সাল হইতে খৃষ্টপূর্বে ২১৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অন্ধ্র বংশ শতবাহন বংশ নামে প্রসিদ্ধ। শতবাহন বংশের ঠিক কোন নৃপতি নাগার্জুনের সমসাময়িক ছিলেন তাহা সঠিক স্থির করা কঠিন। সেই জন্য আমরা নাগার্জুনকে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দীর রাসায়নিক বলিয়া স্থির করিলাম।

নাগার্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইলে ছয়জন স্রাং এর শ্রুত কিম্বদন্তীর অর্থ সঙ্গত হয়। রসরস্বাকরের রাজা শালীবাহন খুব সম্ভবতঃ রাজা শতবাহনের সহিত অভিন্ন। রাজতরঙ্গিনীর মতে নাগার্জুন রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক। কিন্তু কনিষ্কের কাল লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ আছে। ফ্লিট (Fleet) সাহেব কনিষ্কের রাজত্ব আরম্ভের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭ সাল করিয়াছেন, ভিন্সেন্ট স্মিথ ১২০ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন এবং ভাণ্ডার্কার ২৭৮ খ্রীষ্টাব্দ করিয়াছেন। কনিষ্কের যে কালই নির্দ্ধারিত হউক, নাগার্জুনকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দীর লোক বলিয়া নির্দেশ করিলে বেশী ভুল হইবে না। এলবেকনি নিশ্চয়ই নাগার্জুনের কাল ভুল করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতেন এবং “রস” অর্থে পারদ না করিয়া “স্বর্ণ” করিয়া গিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন যে, নাগার্জুনের গ্রন্থ দুস্তাপ্য, অথচ লিখিতেছেন যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে নাগার্জুন গ্রাহহৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুত কথার উপর নির্ভর করিয়া অল্প প্রমাণের বিরোধী মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

নাগার্জুনের চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞান ।

মাধ্যমিক বুদ্ধবশের প্রারম্ভিক নাগার্জুন যে রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বিশেষ পারদর্শী ছিলেন সে সম্বন্ধে বুদ্ধগ্রন্থ সমূহে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তীর মধ্যে একটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত “নাগার্জুনের জীবনীসংগ্রহ” নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ আছে।

“বিদর্ভ দেশের একজন ধনী ব্রাহ্মণের অনেক দিন যাবৎ সন্তানাদি হয় নাই। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে (এই পুত্রই নাগার্জুন) জ্যোতির্বিদগণ বলিলেন যে যদি পুত্রের পিতামাতা একশত ভিক্ষুক ভোজন করান তাহা হইলে পুত্রটি সাত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার পর তাহার আর আয় নাই। সাত বৎসর যখন প্রায় গত হয় তখন পিতামাতা দুঃখে পুত্রকে একটি নির্জন স্থানে রাখিয়া আইসেন। সেই সময়ে একদিন মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর খসপর্ণ ছদ্মবেশে নাগার্জুনকে দেখা দেন এবং বলেন যে মগধে নলেন্দুবিহারে যাইলে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি নলেন্দুবিহারে যাইলে, বিহারাধ্যক্ষ শ্রীসরহস্ত্র নাগার্জুনকে ভিক্ষুক-পদে দিক্ষীত করিলেন। কিছুকাল পরে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তথ্য উপার্জন মানসে তত্ৰাশ্র ভিক্ষুকগণের পরামর্শে নাগার্জুন তত্ৰাশ্র ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া শিক্ষা করিবার জন্ত মহাসমুদ্রের

মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে জৈনিক সাধুপুরুষের নিকট বাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিত্বে একটী সম্মোহিত বৃক্ষের ছাইটি, পত্র একত্র করিয়া তত্পরি আরোহণ করিয়া সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন।.....নাগার্জুন স্বর্ণপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া নলেন্দ্র-বিহারে ফিরিয়া আসেন এবং প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ উৎপাদন করিয়া সেই অর্থে তিনি সমস্ত ভিক্ষুকদিগকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পরে যোগশিক্ষা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। নাগার্জুন অনেক চৈত্য বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীসরহভদ্রের মৃত্যুর পর নাগার্জুন নলেন্দ্রবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া খুব দক্ষতার সহিত বিহারের কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার গুরু সরহভদ্র মাধ্যমিক দর্শনের মাত্র বীজ রোপন করিয়াছিলেন, তিনি এই দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে স্থাপন করেন।”

উপরোক্ত ও অত্রাণ্ড কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে পূর্বে নাগার্জুন ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। শ্রীসরহভদ্র তাঁহার গুরু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নাগার্জুন নলেন্দ্রবিহারের অধ্যক্ষ হন। তিনিই মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এবং একইকালে রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

নাগার্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা।

সুশ্রুতের টীকাকার ডম্বনাচার্যের মতে নাগার্জুন প্রাচীন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্তা ও সুশ্রুতের উত্তরতত্ত্বের রচয়িতা। এই

উত্তরতন্ত্রে বিবিধ ব্যাধি ও কার্যচিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে।
সুশ্রুতের অন্ত্যস্ত স্থানে অস্ত্রচিকিৎসারই বর্ণনা বিশদভাবে আছে,
কার্যচিকিৎসার বর্ণনা খুব সামান্য।

তির্য্যকপাতন (Distillation) আবিষ্কার ।

রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের মতে নাগার্জুন তির্য্যকপাতন
প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা। তির্য্যকপাতন প্রাচীনকালে প্রধানতঃ
সূরা ও পারদ বিপ্লব করিবার জন্যই আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে।
রসেন্দ্রচিন্তামণিতে নাগার্জুন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রবর্তিত তির্য্যক-
পাতন প্রক্রিয়া নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে;—দুইটা কলসী
লইয়া একটি কলসীতে পারদ ও অপর কলসীতে জল রাখিয়া
উভয় কলসীকে তির্য্যক ভাবে বসাইতে হইবে এবং উভয়ের মুখ
একত্রিত করিয়া সেই জোড়মুখ রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে।
অতঃপর যে কলসীতে পারদ আছে সেই কলসীতে জ্বাল দিতে
থাকিবে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত পারদ জলযুক্ত কলসীতে প্রবিষ্ট হয়। (১)
এই প্রক্রিয়া আধুনিক তির্য্যকপাতন প্রণালীর পূর্বাভাস।
জলযুক্ত কলসী condenser এর কার্য্য করিতেছে। জল পাতিত

(১) ঘটে রসঃ বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্তকং ।

তির্য্যক্শুখং ধ্বং কৃত্বা তদুখং রোধয়েৎ স্থবীঃ ।

রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং বাবৎ সূতো জলং বিশেৎ ।

তির্য্যকপাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জুনাদিভিঃ ॥

রসেন্দ্রচিন্তামণি ।

করিতে হইলে জলযুক্ত কলসীর বদলে খালি কলসী ব্যবহৃত হইত এবং কলসীর উপর বহির্দেশে জল ঢালিয়া উহাকে শীতল রাখিতে হইত।

ধাতুর জারণ মারণ আবিষ্কার ।

বহুবিধ তাত্ত্বিকগ্রন্থ একবাক্যে নাগার্জুনকে লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জারণ মারণ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। এই ধাতুমারণ প্রক্রিয়া ও নীচ ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হইতেই রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি। এই দুই প্রক্রিয়ার আবিষ্কারী বলিয়া ভারতে নাগার্জুন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার গৌরবের অধিকারী।

ধাতুবর্গের মারণ প্রক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ আমরা স্মৃশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে দেখিতে পাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ডব্বনাচার্য্যের মতে স্মৃশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা নাগার্জুন। যদি নাগার্জুন উত্তরতন্ত্রের রচয়িতা হন তাহা হইলে উত্তরতন্ত্রে বর্ণিত ধাতুর অয়স্কৃতিবিধি নাগার্জুন প্রবর্তিত ধাতুমারণ প্রক্রিয়ার প্রথম পরিচয়। এই অয়স্কৃতিবিধি ভারতে ধাতুর যৌগিক (compound) প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার প্রথম চেষ্টা। স্মৃশ্রুতে লৌহ ও অগ্ন্যন্ত্র ধাতুর অয়স্কৃতি প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত আছে :—“লৌহের অতি সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণবর্গের প্রলেপ দিবে, পরে সেই লবণলিপ্ত লৌহপাত গোময়গন্ধিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলা ও সালসারাদিগণের কাথ দ্বারা নির্কাপিত করিবে। এইরূপে ষোলবার দগ্ধ ও নির্কাপিত করার পর পুনর্বার তাহা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে।

শীতল হইলে সেই লৌহ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ঘন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। সেই লৌহচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। এইরূপে অগ্নাত্র ধাতুর যথা রঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য ও সূবর্ণের অয়ষ্কৃতি প্রয়োগ করিতে পারা যায়।” (১) এই উপায়ে ধাতুর অক্সাইড্, ক্লোরাইড্ বা অলিক্লোরাইড্ প্রস্তুত হইবে।

চক্রপাণি নাগার্জ্জুনের লৌহমারণ প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, বাহ্যল্যভায়ে সমস্তটা উদ্ধৃত হইল না। স্থূলতঃ লৌহকে ত্রিকলার ও অগ্নাত্র ভেষজের রসে ভাবনা দিয়া পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে সরার মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া মারিত লৌহ প্রস্তুত হইত। এই প্রক্রিয়া স্থানোপাকবিধি, পুটপাকবিধি প্রভৃতি প্রক্রিয়াতে বিভক্ত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া বর্ণন কালে চক্রপাণি হইস্থানে নাগার্জ্জুনের নাম করিয়াছেন যথা—“নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস বল্লোহশাস্ত্রমতিগহণম্”, “লৌহস্ত্র পাকমধুনা নাগার্জ্জুনশিষ্টমভিদগ্ধঃ”। নাগার্জ্জুনের এই লৌহমারণবিধি রসেন্দ্রচিন্তামণিতে আমূল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া।

পূর্বোদ্ধৃত তিব্বতীয় কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে নাগার্জ্জুন হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার প্রক্রিয়া অবগত ছিলেন। হয়েন স্যাং যখন সপ্তম খৃষ্টাব্দীতে ভারতে

(১) সূত্রত সংহিতা, উত্তরতন্ত্র, অয়ষ্কৃতিবিধি।

আগমন করেন তখন তিনি শুনিয়া গিয়াছেন যে নাগার্জুন এমন ঔষধ জানিতেন যাহাতে তিনি সর্ববিধ ষাণ্ডু ও প্রস্তরকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিতে পারিতেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় নাগার্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ রসরত্নাকর নামক একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থের খানিকটা অংশ পাইয়াছেন। তিনি ঝিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে উহা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নাগার্জুনকথিত হীন-ষাণ্ডুকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিবার কয়েকটি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। ঠিক এই সকল প্রক্রিয়া নাগার্জুন কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এই রকম প্রক্রিয়া নাগার্জুনের সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভব। কোতুহলী পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত কয়েকটি প্রক্রিয়া উদ্ধৃত হইল।

(১) “রাজবর্তককে শিরীষপুষ্পের রসের দ্বারা ভাবনা দিলে এক গুণ্ডা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুণ্ডা পরিমাণ নবোদিত সূর্যাসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?”

(২) “গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া

(১) কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্তকঃ
শিরীষপুষ্পাশ্রসেন ভাবিতম্ ।
সিতং সূৰ্য্যং তরুনার্কসন্নিভং
কারোতি গুণ্ডাশতমেকগুণ্ডয়া ।

(২) কিমত্র চিত্রম্ যদি পীতগন্ধকঃ
পলাশনির্যাসরসেন শোধিতঃ ।
আর্য্যাকৈরুংপলকৈস্তু পাচিতঃ
কারোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্ ।

রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আঙুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?”

(৩) “যদি রসককে (calamine).....তিনবার তাম্রের সহিত পুটপাক করা যায়, তাহা হইলে তাম্র কাঞ্চনে পরিণত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?”

(৪) মেঘের দৃষ্টি ও বহু অম্লরসের দ্বারা দরদকে (cinnabar) অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণমসৃশ স্বর্ণে পরিণত হইবে, তাগাতে বিচিত্র কি ?”

অবশ্য এই সকল প্রক্রিয়ায় রৌপ্য বা তাম্র স্বর্ণে পরিণত আদৌ হইবে না, উহাতে মিশ্রধাতু (alloy) বা স্বর্ণের স্তায় রংবিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হইবে। এই সকল প্রক্রিয়ায় পাঠক-বর্গ মনে রাখিবেন—“all is not gold that glitters ।”

কজ্জলী বা রসপর্পটী ।

পারদের আত্যন্তরিক প্রয়োগ নাগার্জুন কর্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ পুর্কোলিখিত রসরত্নাকরে প্রথম দেখিতে পাই। পুর্কোলি বলা হইয়াছে যে এই গ্রন্থখানি সপ্তম

(৩) কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন

ক্রমেণ কৃষ্ণানুধরেণ রঞ্জিতঃ ।

করোতি শুষ্কং ত্রিপুটেণ কাঞ্চনম্ ॥

(৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ স্তব্ধাবিতঃ

পয়েন মেঘা বহুশোহল্লবগৈঃ ।

সিতং স্তব্ধং বহুধর্মেণ ভাবিতং

করোতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণমগ্রভম্ ॥

নাগার্জুন-বিরচিত রসরত্নাকর ।

শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থে পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী ও রসপপ্পটিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আছে * এবং স্বর্ণ, পারদ ও গন্ধক মিলিত করিয়া অক্ষমূষায় লঘুপুটে পাক করিয়া স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই শ্রেষোক্ত সাধকেন্দ্র ভক্ষণ করিলে দিব্যাদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসরত্নাকর নাগার্জুন কর্তৃক বিবরণিত না হইলেও সপ্তম শতাব্দীর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ হইলে সপ্তম শতাব্দীতে কজ্জলী, রসপপ্পটিকা ও স্বর্ণসিন্দুর আবিষ্কৃত ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। রসরত্নাকরের পর বৃন্দের সিদ্ধযোগে একভাগ গন্ধক ও অর্দ্ধভাগ পারদ মিশ্রিত করিয়া “রসামৃতচূর্ণ” প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। বৃন্দ চক্রপাণির পূর্ববর্তী কিন্তু অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে সিদ্ধযোগের একখানি সংস্করণে “রসামৃতচূর্ণের” উল্লেখ পান নাই, কেবল কাশ্মীর হইতে আনীত পাণ্ডুলিপিতে পাইয়াছেন। বৃন্দের পর চক্রপাণি একভাগ পারদ ও একভাগ গন্ধক মিলিত করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা গলাইয়া রসপপ্পটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রস্তুত প্রণালী অনেকটা রসরত্নাকরে

* নৃতকস্য পলং গৃহং তুণ্ডাংশং সাক্তকং বিষম্।

তৎসমং গন্ধকং শুদ্ধং চূর্ণংকৃত্বা বিনিষ্কিপেৎ ॥

কৃত্বা কজ্জলিকামানৌ পলং বত্বা চ গন্ধকং।

স্বতপকঞ্চ তচ্চূর্ণং পচেন্নায়সভাজনে ॥

বাব্রব্রব্রমায়াতি তৎক্ষণাৎ তং বিনিষ্কিপেৎ।

পুটে বা কদলীপত্রে সিদ্ধং পপ্পটিকারসম্ ॥

উল্লিখিত প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত মিলে। কিন্তু চক্রপানি লিখিয়াছেন “রসপপটিকা খ্যাতি নিবন্ধা চক্রপাণিনা।” এক্ষেত্রে আমরা চক্রপাণিকে কজ্জলী ও রসপপটিকার আবিষ্কর্তা না বলিয়া বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রে উহাদের প্রচলয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। রসরত্নাকরের মতে উহাদের আবিষ্কর্তা ও প্রয়োগকর্তা নাগার্জুন।

ইহা ভিন্ন এই রসরত্নাকর গ্রন্থে বিবিধ খনিজ (ore) পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুতবিধি ও পঁচিশ প্রকার যন্ত্রের (যথা ভূধর যন্ত্র, দোলা যন্ত্র ইত্যাদি) উল্লেখ আছে। ধাতুপ্রস্তুত-বিধিগুলি নাগার্জুনের সময় প্রচলিত থাকাই সম্ভব কিন্তু যন্ত্রগুলি নাগার্জুনের পরে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা নাগার্জুনের প্রণীত অগ্রাণ্ড গ্রন্থের সম্যক আলোচনা না হইলে তাঁহার বৈজ্ঞানিক কাণ্ড্যাবলীর সঠিক সংবাদ প্রদান করা অসম্ভব। কিন্তু এটা ঠিক বলিয়া মনে হয় যে নাগার্জুন ধাতুর মারণ প্রক্রিয়া ও হীনধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া ভারতে প্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ের পর হইতে বিবিধ ধাতুর বিবিধ যৌগিক প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বিবিধ যন্ত্রাদিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। তিনি ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের যুগপ্রবর্তক। এই মহাপুরুষের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবলীর সম্যক তথ্য বাহাতে অবগত হইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে সুধীবৃন্দকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। আমরা গেবার, প্যারাসেল্‌স্‌, এভিসেনা, এগ্রিকোলার সহিত পরিচিত কিন্তু ভারতের নাগার্জুন, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রাচীন রাসায়নিকগণ আমাদের অপরিচিত—এ জাতীয় কলঙ্ক আর কতদিন থাকিবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

আর্য্যভট্ট ।

অক্ষশাস্ত্রে প্রাচীন ভারত যে অনেক পরিমাণে জগতের শিক্ষাগুরু ছিল—এ কথা এখন অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত হইয়াছে। দশমিক ভগ্নাংশের (Decimal system) আবিষ্কার সর্বসম্মতি অনুসারে ভারতে হইয়াছিল। সংখ্যালিখনের (system of numeration) পদ্ধতিও ভারতীয় আবিষ্কার। এই ১, ২, ৩, প্রভৃতি সংখ্যাগুলি আরবীয়গণ গ্রহণ করিলে পর তাহা ক্রমশঃ ইউরোপে গৃহীত হয়। প্রাচীন গ্রীসদেশের সহিত প্রাচীন ভারত জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষাগুরু বলিয়া গোবব করিতে পারে। আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্যের অক্ষশাস্ত্র ও জ্যোতিষ সঙ্গন্ধে গবেষণা শুধু ভারতের কেন, জগতের গৌরবের সামগ্রী। এই কয়জন মহাপুরুষের অগ্রণী আর্য্যভট্টের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আর্য্যভট্ট বা আর্য্যভট্টের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খুব কমই জানা গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে তিনি ৩৫৭৭ কল্যাণ্দে বা ৩৯৮ শকে (৪৭৬ খৃঃ অঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আর্য্যভটিয়” বা “আর্য্যভট্টতন্ত্র” রচনা করেন। তিনি গ্রীকদিগের নিকট অনুবৈরিয়স বা অর্জুবৈরিয়স এবং আরবীয়গণের নিকট অর্জভর

নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুম্ভমপুর বা পাটলীপুত্র (আধুনিক পাটনা) তাঁহার বাসস্থান ছিল এবং এই স্থানেই তিনি “আর্য্যভট্ট” গ্রন্থ রচনা করেন।

“আর্য্যভট্ট” গ্রন্থ ।

“আর্য্যভট্ট” গ্রন্থের পূর্বেকার জ্যোতিষ শাস্ত্র বড়ই অনিশ্চিত, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে এক হিসাবে আধুনিক ভারতীয় জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার পূর্বে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ব্যাসসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়া পরবর্তী জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইয়া এখনও বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মসিদ্ধান্ত সর্বপ্রাচীন এবং আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন যে তিনি এই স্বায়ম্ভুব বা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে তিনি প্রাচীন গ্রীকগণের গ্রন্থ হইতে কোনও বিষয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অভিমতগুলি ভারতীয় এবং গ্রীক-সংশ্রবশূন্য। এই গ্রন্থখানি চারিভাগে বিভক্ত গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ এবং গোলপাদ। গণিতপাদে পাটীগণিত এবং বাকি তিন ভাগে জ্যোতিষ ও গোলগণিত আলোচিত হইয়াছে।*

* খৃষ্টপূর্ব দুই তিন সহস্র বৎসরের ভারতীয় জ্যোতিষিক জ্ঞান সম্বন্ধে
Brennand's Hindu Astronomy দেখুন।

পৃথিবী গোলাকার ও শূণ্ণে অবস্থিত ।

পৃথিবীর আকারের স্বরূপ নির্ণয় করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই মানব মনকে উৎসাহিত করে। সাধারণের চক্ষে পৃথিবী সমতলক্ষেত্র কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদে কোনও কোনও স্থলে পৃথিবীর গোলত্বের আভাস পাওয়া যায়, এমন কি পৃথিবী যে অবলম্বন শূণ্ণ হইয়া শূণ্ণে অবস্থিতি করিতেছে তাহার সূচনাও ঋগ্বেদে মিলে। আর্য্যভট্ট অবশ্য পৃথিবীর গোলত্ব (Sphere) ও অবলম্বন শূণ্ণ হইয়া আকাশে অবস্থিতি—এই দুইই স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর শূণ্ণে অবস্থিতি স্বীকার করিলে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি বাস্তবিকই পৃথিবী নিরাবলম্বন, তবে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, পাহাড় পর্বত পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া আছে কিরূপে। তাহার উত্তরে আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন যে গোল কদম্ব পুষ্পের উপরের গ্রন্থিগুলি যেমন পুষ্পের উপর আটকাইয়া আছে, সেইরূপ গোল পৃথিবীর উপর জলজ স্থলজ পদার্থ অবস্থান করিতেছে।* বরাহ, ভাস্কর প্রভৃতি পরবর্তী সকল জ্যোতিষীই পৃথিবীর গোলত্ব ও শূণ্ণে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন। একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—পৃথিবী যদি শূণ্ণে অবস্থিত, তবে পড়িয়া যায় না কেন? তাহার সুন্দর উত্তর ভাস্কর দিয়াছেন “পৃথিবীর চারিদিকেই সমান আকাশ, উহা পড়িবে কোথায়?”

* বহুৎ কদম্বপুষ্পগ্রন্থিঃ প্রতিভঃ সমস্ততঃ কুহনৈঃ ।

ভাস্করি সর্বসমুদ্রলগ্নৈঃ স্থলগ্নৈশ্চ ভূগোলঃ ।

পৃথিবীর আবর্তন আবিষ্কার ।

ভারতে আৰ্য্যভট্ট ভূমণের আবিষ্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধ । কেহ কেহ বলেন যে বেদেও ভূমণ সূচিত হইয়াছে । কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যরূপে আৰ্য্যভট্টই উহার আবিষ্কারক বলিয়াই স্বীকৃত হন । আৰ্য্যভট্টের পরবর্তী জ্যোতিষীগণ কেহই ভূমণ স্বীকার করেন নাই । অতএব এরূপ মনে হয় যে ভারতবর্ষে আৰ্য্যভট্ট একমাত্র ভূমণ আবিষ্কর্তা ও পরিপোষক । গ্রীসদেশে ভূমণবাদ অতি প্রাচীনকালে একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার না করিতে উহা বিলুপ্ত হইয়া যায় । সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পিথাগোরাস * (খৃষ্টপূর্ব

* “চাকা রিভিউ ও সাম্মিলনে” একজন লেখক লিখিয়াছেন (১৩১৮, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২৬০)—“গ্রীসদেশবাসী পিথাগোরাস প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত আৰ্য্যভট্টের মত ভারত হইতে নিয়া স্বদেশে প্রচার করেন ।” বলা বাহুল্য পিথাগোরাস আৰ্য্যভট্টের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন । খ্রীষ্টপূর্ব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন “আর্য্যসিদ্ধান্তকার-গণের মধ্যে আৰ্য্যভট্টই প্রথমে দিবারাত্র ভেদের কারণ স্বরূপ পৃথিবীর আবর্তন স্বীকার করিয়াছিলেন । ইউরোপে শকের পঞ্চাদশ শতাব্দীতে কোপার্নিক প্রথমে ভূমণবাদ যথোচিত প্রকাশ করেন । তাঁহার সহস্র বৎসর পূর্বে আৰ্য্যভট্ট সেই মত আবিষ্কার করিয়াছিলেন” । বলাবাহুল্য কোপার্নিকাসের বহু শতাব্দী পূর্বে পিথাগোরাস পৃথিবীর আবর্তন আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এরিষ্টারকস পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন ও সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণের কথা জানিতেন । কোপার্নিকাসের সহিত আৰ্য্যভট্টের তুলনা চলে না । কোপার্নিকস শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত গ্রহগণের সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবিষ্কার করিয়া আধুনিক জ্যোতিষের জন্ম দিয়া গিয়াছেন । আৰ্য্যভট্টের তুলনা পিথাগোরাসের সহিত চলে ।

পঞ্চম পতাকী) সর্বপ্রথম স্বীকার করেন যে পৃথিবী অচলা নহে, সচলা। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে উহা সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহার পর এরিষ্টারকস (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, এবং স্বীয় অক্ষের উপরেও ঘুরিতেছে বলিয়া দিব্যরাত্র হইয়া থাকে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সকলেই অগ্রাহ্য করেন এবং এরিষ্টারকসের জন্মের প্রায় আঠার সাত বৎসর পরে সুবিখ্যাত জ্যোতিষী কোপার্নিকাস পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগণের সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণের কাহিনী পুনরায় প্রচার করেন। আর্য্যভট্টের সময় গ্রীসদেশে ভূভ্রমণবাদ একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আর্য্যভট্টকে আমরা ভূভ্রমণবাদের একজন মৌলিক আবিষ্কারক বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি। আর্য্যভট্ট বলিতেছেন “চরা পৃথ্বীস্থিরা ভাতি” অর্থাৎ পৃথিবী স্থির বোধ হইলেও বস্ততঃ উহা সচলা। তিনি আরও বলিতেছেন “এক চতুর্য়ুগে (৪২২০০০০ সৌরবর্ষে) পৃথিবীর পূর্বদিকে গতি সম্বৃত ভগণ (rotation) ১৫৮২২৩৭৫০০ বার, অর্থাৎ পৃথিবী ১৫৮২২৩৭৫০০ বার ঘুরিয়া আসিলে (অথবা অত দিনে) এক চতুর্য়ুগ বা ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে আর্য্যভট্ট জানিতেন যে পৃথিবী একবার স্বীয় অক্ষের উপর ঘুরিলে এক দিনমান হয় এবং এক চতুর্য়ুগে পৃথিবী অন্তর স্বীয় অক্ষের উপর ঘোরে। উপরোক্ত গণনায় পৃথিবী যে সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা অনুমিত হয় না। উপরন্তু লগ্ন, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পরবর্ত্তী জ্যোতিষীরা আর্য্যভট্টের মত খণ্ডনকালে স্বীয়

অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে পিথাগোরাসের মত আর্ঘ্যভট্ট অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনের কথা জানিতেন, সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণের কথা জ্ঞাত ছিলেন না।

আর একস্থলে আর্ঘ্যভট্ট এই পৃথিবীর পরিভ্রমণের কথা ধ্রুপদ সূর্যের উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “যেমন গতিশীল নোকার আরোহী তীরস্থিত অচল বৃক্ষাদিকে উন্টাদিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ লঙ্কাতে (পৃথিবীর গতির জ্ঞাত) স্থির নক্ষত্রদিগকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়।” (১) নক্ষত্রবর্গের পশ্চিমদিকে গতি ক্ষুণ্ণগতি (apparent motion), বস্তুতঃ পৃথিবীই পূর্বদিকে গমন করিতেছে এবং সেই পরিভ্রমণের দরুণ নক্ষত্রবর্গকে পশ্চিমদিকে যাইতে দেখা যায়। এখন যেমন গ্রীনউইচ (Greenwich) এর সময় গণনার জ্ঞাত ব্যবহৃত হয় আর্ঘ্যভট্ট লঙ্কার সময় সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

আরও কয়েকটি শ্লোকে আর্ঘ্যভট্ট পৃথিবীর পরিভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন, বাহ্যিক ভয়ে পরিত্যক্ত হইল। পরবর্তী কালে লল্ল, শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরহা প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লল্ল আর্ঘ্যভট্টের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু শিষ্য গুরুর সিদ্ধান্ত মানেন নাই। তিনি পৃথিবীর পরিভ্রমণের বিরুদ্ধে অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপিত

(১) অনুলোমগতি নৌঃ পশ্চাত্যচলঃ বিলোমগঃ বহৎ।

অচলানি ভানি তবৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্।

করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্ত
নিম্নে কতকগুলির নমুনা প্রদত্ত হইল :—

(ক) যদি পৃথিবীই ঘোরে তবে পক্ষীরা উড়িয়া গিয়া আবার
নিজ্জন্মের বাসায় ফিরিয়া আইসে কি প্রকারে ?

(খ) পৃথিবী ঘুরিলে বাণ উর্দ্ধে নির্ক্ষিপ্ত হইলে উহা স্বস্থানে
ফিরিয়া আসিত না, কারণ বাণের পতনকালের মধ্যে পৃথিবী
অনেকটা পূর্বদিকে সরিয়া যাইবে।

(গ) পৃথিবী ঘুরিলে আমরা মেঘকে কখনও পূর্বদিকে যাইতে
দেখিতাম না।

(ঘ) যদি স্বীকার করি যে পৃথিবী আস্তে আস্তে চলিতেছে,
তাহা হইলে আর্য্যভট্টের মতে উহা একদিনে একবার কিরূপে
ঘুরিয়া আসে ?

শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহ প্রভৃতি সকলেই এইরূপ আপত্তি
উত্থাপিত করিয়া পৃথিবীর আবর্তনবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা
পাইয়াছিলেন। ইউরোপে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে যখন কোপার্নিকাস
ভূমণবাদ পুনঃপ্রচারিত করেন তখনও এইরূপ যুক্তির দ্বারা
তঁাহার মতও প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী
টাইকোব্রাহি লল্লের ভ্রায় বুদ্ধিতে পারেন নাই কেন উর্দ্ধে নির্ক্ষিপ্ত
গোলাকে পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না। পাঠক দোঁথিতে
পাইতেছেন এক কথায় এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।
আশ্চর্য্যের বিষয় পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও ঘুরিতেছে—এই
একটা বিষয় কাহারও মাথায় প্রবেশ করে নাই; করিলে
এই সকল আপত্তি আদৌ উত্থাপিত হইতে পারিত না।
পাঠক বুদ্ধিতে পারিতেছেন পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলও

ঘোরাতে লর প্রমুখ জ্যোতিষীদের সকল আপত্তির খণ্ডন হইয়াছে।

এই ভূভ্রমণবাদ ভিন্ন আর্য্যভট্ট আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষিক বিষয়ে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নক্ষত্রগণের দীপ্তির বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোলাকার পৃথিবী, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ সূর্যের দ্বারা আলোকিত হয়; তাঁহাদের যে অর্দ্ধাংশ সূর্যের দিকে থাকে সেই অংশ দীপ্তি পায়, বাকি অর্দ্ধাংশ নিজের ছায়ায় অন্ধকারাবৃত। বৈদিক ঋষি-গণও জানিতেন যে চন্দ্র সূর্য্যতেজে দীপ্তিশালী।

গ্রহগণের কক্ষা (orbit) সম্বন্ধে আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে শনি (saturn), বৃহস্পতি (jupiter), মঙ্গল (mars), শুক্র (venus), বুধ (mercury) ও চন্দ্রের কক্ষা পর পর অবস্থিত ও সকলের অধোভাগে পৃথিবীর কক্ষা। ইহাতে জানা যাইতেছে যে আর্য্যভট্ট জানিতেন না যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগণ ঘুরিতেছে।

আর্য্যভট্ট গ্রহণের (eclipse) প্রকৃত কারণ জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বরাহ আর্য্যভট্টের কিছু পরে বর্তমান ছিলেন। তিনি গ্রহণের প্রকৃত আধুনিক কারণ সন্নিহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গ্রহণ সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পনাকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আর্য্যভট্ট কেবল জ্যোতিষীই ছিলেন না, তিনি একজন প্রগাঢ় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত (Algebra) ও ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

সংখ্যানির্দেশ (Notation)

আখ্যাতটের সময়ে ভারতে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা-নির্দেশক বর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে এই সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পূর্বেও কয়েকটি সংখ্যাবাচক বর্ণ ভারতে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আরবীয় ব্যবসায়ীরা অষ্টম শতাব্দীতে এই ভারতীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আখ্যাতটের সময় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় নাই, তিনি ক, খ, গ প্রভৃতি বর্ণমালা সংখ্যানির্দেশকরূপে ব্যবহার করিতেন। এই বর্ণমালা ব্যবহার করিয়াও তিনি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এস্থলে ভারত হইতে কেমন করিয়া সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা ইউরোপে গৃহিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আরবীয় অঙ্কশাস্ত্রবিংগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বেন মুসা (৯০০ খৃঃ অঃ) সর্বপ্রথম ভারতীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন এবং ক্রমশঃ অপর অপর আরবীয় বৈজ্ঞানিকেরাও তাহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন ইউরোপে I II III প্রভৃতি রোমীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা প্রথমে ব্যবহৃত হইত কিন্তু ১০০০ খৃষ্টাব্দে রিমস্ প্রদেশের আর্কবিশপ সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্মযাজক গারবাট' এবং তাঁহার পরে রোমের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার আরবীয়গণের নিকট হইতে হিন্দুদের সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা গ্রহণ করিয়া ইউরোপে প্রচলিত করেন। ১২০২ খৃষ্টাব্দে পিসার সুপ্রসিদ্ধ লিওনার্ডো

তাঁহার গ্রন্থে প্রথম এই সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এখনও এই বর্ণমালাই জগতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত, পূর্বেকার রোমীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা কুচিৎ বিশেষ কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমীয় বর্ণমালায় হিসাব রাখা বা অঙ্ককসা অপেক্ষা ভারতীয় বর্ণমালায় অঙ্ককসা সহজ বলিয়া উহা সর্বত্রই গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে ভারতীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা হইতে কিরূপে সামান্য পরিবর্তিত হইয়া প্রাচীন আরবীয় ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। *

দেবনাগর (৯৫০ খৃঃ অঃ)	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
আরবীয় (১১০০ খৃঃ অঃ)	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
জার্মান (১৩৮৫ খৃঃ অঃ)	১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
ইটালিয় (১৪০০ খৃঃ অঃ)	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ইংরাজি (১৪৮০ খৃঃ অঃ)	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
স্কট বা ফরাসী (১৪৮২ খৃঃ অঃ)	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

* এই তালিকাটি Ball's History of Mathematics নামক গ্রন্থে
কইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বীজগণিত (Algebra)

আর্যভট্ট প্রাচীন ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক বীজগণিত-প্রণেতা। তিনি অনেকগুলি বীজগণিত সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ইউরোপে ডাইওফেন্টাস বীজগণিতের প্রাচীন রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার আবির্ভাবকাল ঠিক জানা নাই—সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্তমান ছিলেন। তিনি এলেক্সেন্দ্রিয়াবাসী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ অনেকদিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং প্রায় ৯৬০ খৃষ্টাব্দে ডাইওফেন্টাসের বীজগণিত আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। ডাইওফেন্টাসের গ্রন্থ আর্যভট্টের সময় বা তাঁহার অনেক পর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল এবং সেইজন্ত আর্যভট্টকে আমরা বীজগণিতের একজন মৌলিক আবিষ্কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। কোলব্রুক প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আরবীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বোগদাদের আল মামুন, হারুন আল রসিদ, আল মামুদ, এবং আল মতাদেদ এই চারিজন বাদসাহের আমলে প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া (৭৫৪ হইতে ৯০৪ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময়ে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতিষীগণের গ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত এবং পঠিত হয়। ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ আল মানসুরের সময় ভারতীয় জ্যোতিষীগণ বাদসাহের দরবারে আহৃত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি ভারতীয়

জ্যোতিষীগণের বীজগণিত সম্বন্ধে জ্ঞানও আরবীয়গণের নিকট পহুছে। সেইজন্ত আরবীয় বীজগণিত ভারতীয় বীজগণিতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। ৯০০ খৃষ্টাব্দে বেন মুসা আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিত রচনা করেন। এই আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পিসার লিইনার্ডো ১২০২ খৃষ্টাব্দে বীজগণিতের বীজ ইউরোপে প্রোথিত করেন; সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ ক্রমশঃ ফলেফুলে পরিণত হয়। যেমন সংখ্যানির্দেশক বর্ণমালার জন্ত পৃথিবী ভারতের নিকট ঋণী, সেইরূপ বীজগণিত সম্বন্ধেও ইউরোপ প্রাচীন আরবীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্য দিয়া ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় বীজগণিতবেত্তাগণের মধ্যে অগাধভট্ট সর্বপ্রাচীন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কুট্টকবিধির (Algebraic analysis) আবিষ্কর্তা। তিনি বর্ণায়ক সমীকরণ (quadratic equation) জানিতেন এবং—

$$১+২+৩+৪+.....$$

$$১^২+২^২+৩^২+৪^২+.....$$

$$১^৩+২^৩+৩^৩+৪^৩+.....$$

এই তিন শ্রেণীর যোগফল কসিয়াছেন। তাহা ভিন্ন তিনি বীজগণিতের আরও অনেকগুলি সমীকরণের অঙ্কফল দিয়াছেন।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধেও আর্যভট্ট প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীগণের অগ্রণী এবং প্রাচীন ইউরোপীয় ও আরবীয়-গণের মধ্যে একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ত্রিকোণমিতিতে তিনি অনেকগুলি কোণের (angle) জ্যার (sine) একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দ্বিগুণিত কোণের অর্দ্ধ পূর্ণজ্যাকে (semichord of double the angle) জা। বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথম বৃত্তপাদের (first quadrant of a circle) ৩৬ ডিগ্রি বা তাহার গুণিত কোণের জ্যা নির্ধারণ করিয়া তিনি এই তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি ৯০ ডিগ্রির জ্যা ৩৪৩৮ বলিয়া স্থির করেন। এই গণনায় তিনি $\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}}$ এর সংখ্যা নিশ্চয়ই ৩:৪১৬ ধরিয়াছিলেন, নহিলে এই অঙ্ক ঠিক হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এই সংখ্যা ৩:১৪১৫৯ বলিয়া নির্ণয় করেন। তিনি পরিশ্রম-লাভবমানসে ভূপরিধি গণনাকালে এই সংখ্যাকে $\sqrt{10}$ বা ৩:১৬২৩ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ঠিক সংখ্যা যে ৩:১৪১৬ তাহাও যে তিনি জানিতেন তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে জানা যায়। ইহা ভিন্ন ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি অঙ্ক তিনি কসিয়াছিলেন। জ্যামিতি (Geometry) সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রমাণে ভুল আছে। বস্তুতঃ জ্যামিতির জ্ঞান প্রাচীন গ্রীসদেশে যেমন উন্নত ছিল, ভারতে সেরূপ ছিল না।

ব্রহ্মগুপ্ত, ব্যরাহমিহির ও ভাস্করাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষী ও অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা আখ্যভট্টের পরবর্তী। তাঁহাদের কর্মময় জীবনের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধে তাঁহাদের অগ্রণীর আবিষ্কার কাহিনীর কতক আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়াতে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ডারুইন ।

উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যত বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল একহিসাবে ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাহারা সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটাইয়াছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি তাদৃশ কার্য্যকরী নহে । আবার একপাশে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে যাহা স্বল্পায়াসে সিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তাহার ফল বহুদূরগামী । ডারুইনের বৈজ্ঞানিক সাধনা এক দিকে যেমন বহু আয়াসসাধ্য অপর দিকে তাঁহার আবিষ্কারগুলির প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত । উদ্ভিদবিজ্ঞা, প্রাণীবিজ্ঞা, ভূবিজ্ঞা প্রভৃতি বহুশাস্ত্র তাঁহার আবিষ্কারের ফলে নূতন আলোক লাভ করিয়াছে । বিংশ শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও আবিষ্কার এত অধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয় নাই বলিয়া ডারুইন তাঁহাদের মধ্যে অবিসম্বাদীরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

চার্লস রবার্ট ডারুইন ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অস্তঃপাতী স্ক্রবেয়ী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার পিতার নাম রবার্ট ওয়ারিং ডারুইন । তিনি একজন সূচিকিংসক ছিলেন । তাঁহার প্রপিতামহ সুপ্রসিদ্ধ ইরাসমাস ডারুইন ।

ইনিও একজন বড় ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ডারুইনের বয়স যখন মাত্র আট বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। এখন হইতে তাঁহার লালন পালন ও শিক্ষার ভার তাঁহার বড় ভগিনীগণের উপর পড়ে। ডারুইনের ভ্রাতা ভগিনী ছিলেন পাঁচজন, তিনি সকলের কনিষ্ঠ। ডারুইন পিতাকে বড় ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহার কথা অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৮১৮ সালে তিনি স্ক্রুইক স্কুলে প্রেরিত হন। এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার বাটলার; ইনি পরে লিচফিল্ডের বিশপ হন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে ডারুইন তাঁহার মত চিকিৎসাবিজ্ঞা অধ্যয়ন করেন। সেইজন্ত ১৮২৫ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁহার অদৌ ভাল লাগিল না। কিন্তু এইখানে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের কার্যের প্রথম সূচনা আরম্ভ করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার গ্রাণ্টের সহিত বন্ধুত্বস্থানে আবদ্ধ হওয়াতে তাঁহার সঙ্গে ডারুইন সমুদ্রতীরস্থ জীব, জন্তুর নমুনা সংগ্রহ করিতে যাইতেন। এইরূপে ১৮২৬ সালে তিনি প্লিনিয়ান সোসাইটিতে দুইটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই প্রবন্ধে “চার্লস ডারুইন কর্তৃক ধৃত” এই কথাগুলিতে যে তিনি কত আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্রে অবগত হওয়া যায়।

দুই বৎসর এডিনবরাতে থাকার পর তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞা অধ্যয়নের সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তাহার পর ধর্ম্মবাজকের কার্যে তাঁহার জন্ত অবধারিত হয়। সেই জন্ত তিনি ১৮২৭ সালে

বিখ্যাত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজে ভর্তি হন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেন্সলোর সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে অল্প দিকে পরিচালিত হইয়া যায়। অধ্যাপক হেন্সলো প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পরে খনিজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এবং ছাত্রদিগের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিতেন। সেইজন্য ছাত্রদিগের মনের উপর তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। ডার্কইন হেন্সলোর প্রিয়পাত্র হইলেন, এমন কি বেড়াইতে যাইবার সময়ও হেন্সলো তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। সেইজন্য ডার্কইনের সহপাঠীরা তাঁহাকে “হেন্সলোর সহচর” বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। ডার্কইনের মনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ জন্মাইয়া দিবার জন্য অধ্যাপক হেন্সলোর নিকট সমস্ত জগৎ বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহার সংসর্গ না পাইলে ডার্কইন ডার্কইন হইতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। ১৮৩১ সালে হেন্সলোর পরামর্শে ডার্কইন ভূবিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ভূবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে হেন্সলোর সহিত ওয়েলস্ প্রদেশে যাত্রা করেন। এই ভূবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁহার বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

“বিগল্”এ সমুদ্র যাত্রা।

তিনি শিকার বড় ভাল বাসিতেন। এক দিন শিকার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপক হেন্সলোর একখানি

পত্র পাইলেন। এই পত্রে অধ্যাপক হেন্সলো তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে, “বিগ্ল” নামক জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা সার্ভে করিতে যাইতেছে এবং জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ফিজরয় সঙ্গে লইবার জন্ত একজন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি ডারুইনকে এই কার্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন এবং ডারুইনকে এই পদ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন। ডারুইন এই পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণের এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের ধর্ম-যাজকের পদোপযুক্ত পাঠের বিষ উপস্থিত করিবে। অবশেষে তাঁহার খুলতাতের সর্বশেষ অনুরোধে তাঁহার পিতা সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হন। পিতার সম্মতি পাইয়া ডারুইন ১৮৩১ সালে ২২এ ডিসেম্বর তারিখে বিগ্ল জাহাজে সমুদ্র-যাত্রা করেন। তাঁহার মাহিনার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কাপ্তেন সাহেবের ঘরেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল।

এই সমুদ্রযাত্রা ডারুইনের পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা ও সাধনার প্রধান সহায়ক হইয়াছিল। ইতিপূর্বে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হম্বোল্ট সাহেবের “আত্মজীবনী” পাঠ করিয়া দেশ ভ্রমণের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা করিবার আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। পৃথিবী ভ্রমণের এই সুবিধাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য তাঁহার সমধিক বর্দ্ধিত হইল। এই সময়কার তাঁহার চিঠি পত্রে জানা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত

হইয়া যাইতেন; নানা দেশের পশুপক্ষী, তরুবৃক্ষরাজি, মৃত্তিকা প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এতই আনন্দ লাভ করিতেন যে সময় সময় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রাই হইত না। তিনি বিগ্‌ল্‌এ যাত্রা করিবার পূর্বে কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু স্বভাবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পাঁচ বৎসর পরে যখন দেশে ফিরিলেন তখন তিনি ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার বিবিধ জীবকঙ্কাল (fossils), গ্যালাপেগো দ্বীপের বিবিধ পক্ষী, সমুদ্রের মধ্যস্থিত প্রবালস্তূপ (coral reefs) প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন ও পরীক্ষার পর তাঁহার মনে ক্রমবিবর্তনবাদ (theory of evolution) ক্রমশঃ সুস্পষ্টাকারে প্রতীয়মান হইতেছিল। ১৮৩৬ সালে ৬ই অক্টোবর তারিখে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিবার কল্পনা স্বতই ত্যক্ত হইল। আমেরিকা হইতে তিনি নানা প্রাণীর কঙ্কাল এবং খনিজ প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, এখন এইগুলি শ্রেণীবিভাগ করিতে এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সরকারি তহবিল হইতে এক হাজার পাউণ্ড (পনের হাজার টাকা) প্রাপ্ত হইয়া অগ্রাগ্র বৈজ্ঞানিক-গণের সহায়তায় গত সমুদ্রযাত্রার ফলস্বরূপ আহৃত প্রাণিবিদ্যা ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত তিনি “জিওলজিক্যাল সোসাইটির” সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূবিদ্যা বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই সভায় পঠিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ সালে ২৯এ জানুয়ারী তিনি বিবাহ করেন। বিবাহ

করিয়া প্রায় তিন বৎসর লণ্ডন সহরে বাস করিয়াছিলেন, তাহার পর লণ্ডন হইতে বোল মাইল দূরবর্তী ডাউন নামক একটি নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বাস করিতে যান। এই স্থানেই তিনি বরাবর ছিলেন এবং তাঁহার ষাবতীয় গবেষণা এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। ডারুইনের সকল গবেষণার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে; কয়েকটি স্থূল বিষ্ণুর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্তনবাদ।

ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদের পরিচয় দিবার পূর্বে প্রাচীন ভারতের ক্রমবিবর্তনবাদের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্রমবিবর্তনবাদ দার্শনিক অনুমানরূপে প্রাচীন গ্রীস দেশে ও ভারতে প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই, তবে মনে হয় যে, প্রাচীন ভারতে এই ক্রমবিবর্তনবাদ দুইটি অনুমানে বেশ সুস্পষ্ট—প্রথম দশাবতার বাদ, দ্বিতীয় আত্মার পরাবর্তনবাদ (transmigration of soul)। এই দশাবতারবাদের মধ্যে ক্রমবিবর্তনের একটা দিক আছে, তাহা অনেকে বড় একটা লক্ষ্য করেন না। এই দশাবতারবাদে বলা হইতেছে যে, ভগবান মানবরূপ ধারণ করিবার পূর্বে প্রথমে মৎস্য (জলজ) পরে কৃষ্ণ, (জলজ ও ভূচর) বরাহ, (পশু) নরসিংহ (অর্দ্ধ মানব), ক্রমশঃ বামন (ক্ষুদ্রাকার মানব) রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে বামনাকার ছাড়িয়া পরশুরাম অর্থাৎ যুদ্ধোপজীবী আদিম মানুষ (primitive man) পরিণত হন। পূর্ণ মানবধর্মী-

বলদ্বী হইতেছেন রামচন্দ্র । ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার না করিলে
এই দশাবতারবাদের প্রচলন ভারতে আদৌ সম্ভবপর
হইত না ।

প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্তনবাদের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ
—আত্মার পরিভ্রমণ বা জন্মান্তরবাদ । এই জন্মান্তরবাদ
যোনিভ্রমণবাদে পরিণত হইয়াছিল । এই যোনিভ্রমণবাদে
দেখিতে পাই যে, আত্মা মানবদেহে অধিষ্ঠান করিবার পূর্বে বহু
যোনি ভ্রমণ করিয়াছে । অনেক পুরাণে এই যোনিভ্রমণবাদ
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

স্থাবরং বিংশতেলক্ষং জলজং নবলক্ষকং ।

কুর্মাশ্চ নবলক্ষঞ্চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥

ত্রিংশলক্ষং পশুনাঞ্চ চতুল্লক্ষং চ বানরাঃ ।

ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য তৎ কৰ্ম্মানি সাধয়েৎ ॥ *

* এই শ্লোকটি ঐভাবে বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টো-
পাধ্যায় কৃত “The Economic Botany of India”তে উদ্ধৃত হইয়াছে
(৩৩পৃষ্ঠা) ; কিন্তু “বিশ্বকোষে” “যোনি” শব্দক শব্দের অর্থ প্রদানকালে ঐ
শ্লোকটী নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ ।

কুমরো রত্নসংখ্যাকাঃ পক্ষিনাং দশলক্ষকম্ ॥

ত্রিংশলক্ষানি পশবশ্চতুল্লক্ষানি মনুষ্যাঃ ।

সর্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যাগাৎ ॥

এই পাঠে “বানরাঃ” শব্দ না থাকিলেও সৃষ্টির ক্রমবিবর্তন বেশ ভালরূপই
সূচিত হইয়াছে । “বিশ্বকোষ”কার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আরও কয়েক-
খানি গ্রন্থ হইতে এই যোনিভ্রমণবাদমূলক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন যথা :—

মানবজন্ম লাভ করিবার পূর্বে প্রথমে স্থাবর (বৃক্ষাদি), পরে ক্রমশঃ জলজ (মৎস্তাদি), কৃমি (জলচর ও স্থলচর), পক্ষী ও পশু জন্মলাভ করিতে হয়। তৎপরে বানরজন্ম এবং বানরজন্মের পরই মানবজন্ম। এই যোনিভ্রমণবাদে প্রথমে বৃক্ষ, ক্রমশঃ জলজ, উভজ, পক্ষী, পশু, বানর ও সর্বশেষে মানবের উৎপত্তির বিষয় লক্ষ্য করিয়া কেহই প্রাচীন ভারতে ক্রমবিবর্তনের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করিতে পারিবেন না। শুধু ইহাই নহে—আধুনিক ভূবিজ্ঞাবিশারদেরা পরীক্ষার দ্বারা প্রাচীন জীবকঙ্কালের (fossil) ক্রমবিবর্তনের যে বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার পোধ্যাপোধ্য উল্লিখিত যোনিভ্রমণবাদের পোধ্যাপোধ্যের সহিত মিলে। ভূবিজ্ঞাবিদেৱা দেখিতে পাইয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন যুগের পর্বতসমূহে

স্থাবরাস্ত্রিংশলক্ষ জলজা নবলক্ষকঃ।

কৃমিজা দশলক্ষ চত্বলক্ষ পক্ষিণঃ ॥

পশবো বিংশলক্ষ চতুলক্ষ মানবাঃ।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা বিজয়মুপজায়তে ॥

(কৰ্মবিপাক)

চতুরশীতি লক্ষানি চতুর্ভেদাশ জন্তবঃ।

অণ্ডজা ষেদজাশ্চৈব উদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥

একবিংশতিলক্ষানি হণ্ডজাঃ পরিকীর্তিতাঃ।

ষেদজাশ্চ ভৈবোক্তা উদ্ভিজ্জাশ্চ প্রমাণতঃ ॥

জরায়ুজাশ্চ তাবন্তো মনুষ্যাণ্যশ্চ জন্তবঃ।

সর্বেষামেব জন্তনাং মানুষজং সূচুর্লভম্।

(গরুড়পুরাণ)।

কেবল মাত্র জলজ জন্তুরই কঙ্কাল (যথা মৎস্তের কাঁটা) দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন প্রকার উন্নত জীবের অস্তিত্ব তথায় মিলে না। ইহা অপেক্ষা আধুনিক যুগের পর্বতসমূহে মৎস্তের সঙ্গে বেঙ কুস্তীরের মত উভচর (জলচর ও ভূচর) জন্তুর কঙ্কালও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী যুগের পর্বতসমূহে পাখাবিশিষ্ট জন্তু ও ক্রমশঃ পক্ষীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আধুনিক কালের মৃত্তিকার স্তরে ক্ষুদ্র চতুষ্পদ পশু, ক্রমশঃ বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুর দেহাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সকল চতুষ্পদ জন্তু আধুনিক অশ্ব, গাওয়ার প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তু হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন। সমকালীন মৃত্তিকাস্তরের ভিতর বানরের হাড় প্রথম পাওয়া গিয়াছে। ভূবিজ্ঞানবিদগণের এই পরীক্ষামূলক আবিষ্কার ভারতে যোনিভ্রমণ-বাদের পোষ্যাপোষ্য সমর্থন করিতেছে।

ক্রমবিবর্তনের সমর্থক পরীক্ষামূলক তথ্য নিরূপণ।

ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ প্রচারের পূর্বে অনেক পরীক্ষামূলক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ডারুইন তাঁহার মত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ভূবিজ্ঞানবিদগণের জীবকঙ্কাল আবিষ্কার ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ প্রচারকল্পে সহায়ক হইয়াছিল। এমন অনেক জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সে সকল জন্তু এককালে জীবিত ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাই। এক

প্রকার “পক্ষী-সরীসৃপ” আবিষ্কৃত হইয়াছে ; উহার আকৃতি পক্ষীর মত কিন্তু সরীসৃপের মত দাঁত ও মাড়ি আছে। আমেরিকায় একপ্রকার অশ্বকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে—উহার খুর বিভক্ত, আর এক প্রকার অশ্বের খুর সম্পূর্ণরূপে অবিভক্ত। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে আধুনিক অশ্ব এই সকল মৃত জন্তু হইতে ক্রমশঃ জন্মলাভ করিয়াছে। ক্রান্তদেশে একপ্রকার প্রকাণ্ড হস্তী ও গণ্ডারের দেহাবশেষ মৃত্তিকামধ্যে পাওয়া গিয়াছে—এই সকল জন্তু আধুনিক হস্তী ও গণ্ডার হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। এই সকল কঙ্কাল হইতে স্বতই প্রশ্ন উঠে—কিভাবে আধুনিককালের জন্তুরা পূর্ববর্তীকালের জন্তুগণের বংশধর হইতে সক্ষম হইয়াছে ?

জন হটার ও সেন্ট-হিলেরার প্রভৃতি প্রাণিবিদ্যাবিদেরা দেখান যে সমাজাতীয় জন্তুদের হাড়ের মধ্যে অদ্ভুত ঐক্য আছে ! মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের (vertebrates) ক্ষুদ্রতম হাড়ের মধ্যেও ঐক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে বাঘড়ের ডানা, শুক্ককের পাখনা, ঘোড়ার সামনে পা ও মানুষের হাতের গঠনপ্রণালী একইরূপ, কেবল বিভিন্নকার্যের উপযোগী করিবার জন্য কাহারও হাড় ছোট, কাহারও বৃহৎ, কাহারও ছড়ান, কাহারও বা গুটান। এইরূপ ঐক্য বশতঃ একই শ্রেণী হইতে ক্রমান্বয়ে এই সকল জন্তুর সৃষ্টি সম্ভব হইতেছে।

আবার অনেক জন্তুর এমন অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, বাহ্যিক তাহার কোনও কাজে লাগে না। অত্যাশ্চর্য্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের (mammals) মত তিমি মাছের দাঁত আছে বটে, কিন্তু সে দাঁতগুলি কোন কাজে আসে না, কারণ সে মাড়ির

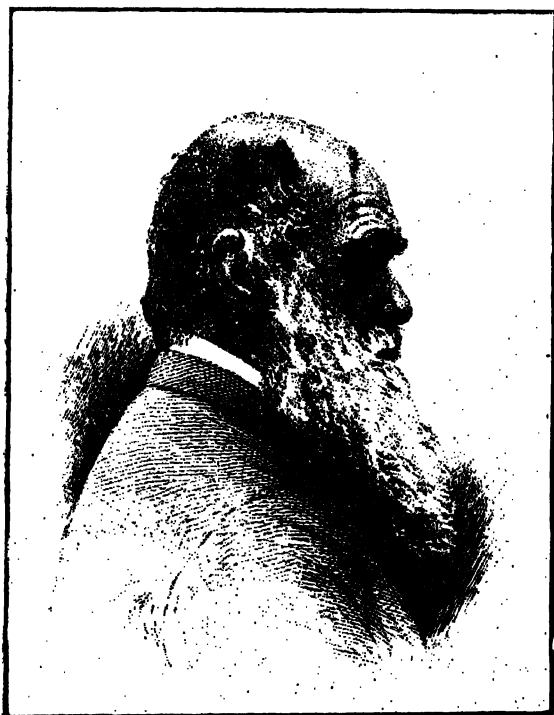
ভিতর ফুঁড়িয়া যায় নাই। একপ্রকার সরীসৃপ আছে—তাহার চামড়ার ভিতর হইতে পিছনদিকে দুইটি পা দেখা যায়, কিন্তু সে পা মাটিতে ঠেকিতে পারে না, স্ততরাং কাজে লাগে না। এইরূপ অব্যবহার্য ইন্দ্রিয়গুলি উহারা অগ্রাশ্রয় স্তম্ভপায়ী জন্তুদিগের নিকট উত্তরাধিকারীস্বত্রে পাইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

ভাষ্যভার নামক একজন বৈজ্ঞানিক আর একটা আশ্চর্য্য তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চতুষ্পদ (quadrupeds) প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জীবের জ্ঞান পুষ্ট হইবার আগে মৎস্য সরীসৃপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জীবের অপুষ্ট জ্ঞানের আকৃতির তুল্য। যদি প্রত্যেক জীব আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইত তাহা হইলে কুকুর প্রথমে মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষীর আকৃতি পাইবে কেন এবং কেনই বা অপ্ৰয়োজনীয় ইন্দ্রিয় বা অংশগুলি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিবে? এমন কি পুষ্ট হইবার আগে মানবের জ্ঞান ও কুকুরের জ্ঞান প্রায় আকৃতিতে একইরূপ।

উদ্ভিদরাজ্যেও এইরূপ ঐক্য ও পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। এক গণভুক্ত বিভিন্ন উপগণের (species) পার্থক্য এরূপ নিগাহিয়া গিয়াছে যে ধরা কঠিন। ডার্কইন দেখাইয়া দিলেন সে পার্থক্য এত অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে যে প্রকার (varieties) এবং উপগণের (species) মধ্যগত পার্থক্য ধরা যায় না। বিভিন্ন গোলাপ গাছ একজন সতের উপগণে বিভক্ত করিয়াছেন, আর একজন তাহাদের মধ্যে পাঁচটির বেশী উপগণ খুঁজিয়া পান নাই। আবার একশ্রেণীর উদ্ভিদ জন্তুর মত কার্য্য করে। ইহারা কীটভোজী, কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়। তাহাদের পাতার উপরে কীটপতঙ্গ বসিলেই পাতাগুলি

আপনি মুড়িয়া যায় এবং যেমন ভোজনের সময় ও পরে প্রাণিদেহের পাকস্থলীতে পাকরস বহির্গত হয়, কীটভোজী উদ্ভিদ হইতেও সেই প্রকারের রস বহির্গত হওয়াতে কীটগুলিকে উদ্ভিদ শীঘ্রই হজম করিয়া ফেলে। এই সকল উদ্ভিদ প্রাণীরাজ্য ও উদ্ভিদরাজ্যের মধ্যবর্তীভাবে সৃষ্ট হইয়াছে।

ডার্কইন এই সকল তথ্য প্রায় দিশ বৎসর যাবৎ অধ্যয়ন



ডার্কইন

করিয়াছিলেন। কত অসংখ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে এই সময়ে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া নিজেই ডাকুইন পরে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন যে, কেমন করিয়া তিনি এত পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা ভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় পায়রা পুখিয়ার গাছপালা পুঁতিয়া বিস্তর পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি ক্রমশঃ ক্রমপরিবর্তনবাদের সত্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদ্ভিত হয় নাই। ১৮৫৮ সালে তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ সার চার্লস লায়েলের অনুরোধে তিনি তাঁহার পরীক্ষার ফল ও সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে ১৮৪৪ সালে তাঁহার অভিনত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাহাও প্রকাশ করেন নাই। এখন দেখিলেন যে তাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণার ফল এত জমিয়া গিয়াছে যে, তাহা একখানি পুস্তকে বাহির করা অসম্ভব; সেই জন্ত তিনি তাঁহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতে মানস করিলেন।

এই সময়ে ১৮৫৮ সালে ১৮ই জুন তারিখে তিনি ওয়ালেস নামক আর একজন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে কতকগুলি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। ওয়ালেস মালয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার স্বকীয় গবেষণার দ্বারা তিনিও ডাকুইনের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছিলেন—এমন কি দুইজনের লেখাতে স্থানে স্থানে ভাষারও মিল ছিল। বলা বাহুল্য ওয়ালেস ডাকুইনের কার্যাবলীর কোনও

সংবাদ জানিতেন না। ডারুইন এই পাণ্ডুলিপিগুলি লায়েল, হকার প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন। তাঁহারা ঠিক করেন যে ওয়ালেস ও ডারুইন এই দুইজনের প্রবন্ধই একসঙ্গে পঠিত ও মুদ্রিত হইবে। উভয় প্রবন্ধই ১৮৫৮ সালে ১লা জুলাই তারিখে লিনিয়ান সোসাইটিতে পঠিত এবং ঐ সভার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাটি বিজ্ঞান জগতের পক্ষে ঐশ্বর্য হইয়াছিল, কারণ এ ঘটনাটি না ঘটিলে ডারুইনের অভিমত কোনও কালে প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহস্থল। এমন কি ১৮০০ সালে তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ৪০০ বা ৫০০ পাউণ্ড দিয়া একজন পুস্তক প্রকাশকের দ্বারা এই প্রবন্ধ যেন প্রকাশ করা হয়।

ক্রমবিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন।

১৮৫৯ সালে ২৪এ নভেম্বর তারিখে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত “উপগণের উৎপত্তি” (origin of the species) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সেই দিনই যত কপি পুস্তক ছাপা হইয়াছিল (১২৫০ কপি) সমস্তই বিক্রীত হইয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর ক্রমবিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ (natural selection) এত উদাহরণ ও পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তাঁহার পূর্বে ল্যামার্ক জীবজন্তুদিগের গঠনপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, সমস্ত জীবজন্তু কয়েকটি আদি জীবজন্তু হইতে সৃষ্ট। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না কেহ দেখাইতে

পারেন যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে উৎপন্ন জীবজন্তু পৃথক পৃথক হইয়াছে ততদিন ল্যামার্কের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। ল্যামার্কের বিশ বৎসর পরে ডার্কইন এবং ওয়ালেস এই বিষয়ের সহুত্তর প্রদান করেন। তাঁহারা দেখাইলেন যে “প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে” বৃক্ষাদি এবং জন্তুগণের মধ্যে পৃথক পৃথক উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বে বৈজ্ঞানিক-গণের ধারণা ছিল যে প্রত্যেক প্রকারের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে আলাহিদা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদেরই বংশধর আধুনিক কালের বৃক্ষলতা ও জীববস্তু। ডার্কইন ও ওয়ালেস বলিলেন যে তাহা হইতে পারে না। যাবতীয় বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু কয়েকটি বড় বড় গণে বিভক্ত এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সেট সকল গণ হইতে বিভিন্ন উপগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক নির্বাচন দুইটি মূলমন্ত্রে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

• (ক) প্রত্যেক বৃক্ষলতা বা জীবজন্তু বংশ রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্ট, কিন্তু যদি সকল বীজই রক্ষিত হয় তাহা হইলে উৎপন্ন সকল বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুকে স্থান বা আহার দান করা পৃথিবীর পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্তু যাহারা জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষমপেক্ষা সমর্থ তাহারাই জীবিত থাকিবে (survival of the fittest) বাকি সব মরিয়া যাইবে। ওয়ালেস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া পক্ষীর যদি বৎসরে চারিটি করিয়া সন্তান হয় এবং তাহাদেরও আবার সন্তানাদি হইতে থাকে ও সকলগুলি জীবিত থাকে তাহা হইলে পনের বৎসরে একজোড়া পক্ষীর প্রায় বিশ কোটি বংশধর হইবে।

হাক্সলে সেইরূপ গণনার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে একটি উদ্ভিদ হইতে বৎসরে মাত্র পঞ্চাশটি বীজ উৎপন্ন হইলে নয় বৎসরে তাহার বংশধরেরা সমস্ত পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিবে এবং পৃথিবীতে আর অল্প বৃক্ষের জন্ত স্থান থাকিবে না। এই অসংখ্য বংশধরের মধ্যে যাহারা সর্কোপেক্ষা উপযুক্ত তাহারাই জীবিত থাকিবে। বলিষ্ঠ পিতার বংশরক্ষা সর্কোপেক্ষা বেশী সম্ভবপর। নানা প্রাকৃতিক কারণে অধিকাংশ বৃক্ষ ও জন্তুর সন্তানগুলি মারা যায়। জলবায়ু, কীটপতঙ্গ, সংক্রামক রোগ প্রভৃতি ইহাদের মৃত্যুর প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক কারণ। একটা দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতে পারে। এক একটা তেঁতুল গাছের বৎসরে সহস্র সহস্র বীজ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধিকাংশ বীজই গাছের নিচে পড়ে বলিয়া, আওতায় অধিকাংশ বীজের অঙ্কুরই হয় না, যেগুলি হয় তাহারো মরিয়া যায়। একস্থানে অনেক বীজ পড়িলে তাহারো আহার না পাইয়া অধিকাংশ মরিয়া যায়। উচ্চ পর্বতে, বরফের দ্বারা আবৃত আটক মহাদেশে বা মরুভূমিতে অনুপযোগী জলবায়ুর জন্ত বৃক্ষলতা জন্মে না, জীবজন্তুর সংখ্যাও খুব কম। মানুষের সন্তান জননের ক্ষমতা কম, কিন্তু পঁচিশ বৎসরে মানবের সংখ্যাও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

(খ) সন্তানগণ পিতামাতার দৈহিক গঠন উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বীজের তারতম্যে কোনও দুইটি সন্তান একরূপ হয় না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এক একটা বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর কোনও বিশেষ ইঞ্জিয় বা ইঞ্জিয়চয় সামান্য পরিবর্তিত হয় এবং তাহা ক্রমশঃ বংশধরদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে থাকে।

নানা প্রাকৃতিক কারণে এইরূপে একই গণ হইতে বিবিধ উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ উপগণের উৎপত্তি যে সম্ভব তাহা আমরা পশুপক্ষী পালনে মানব কর্তৃক নির্বাচনে (Selection by 'man') স্পষ্ট দেখিতে পাই। বাঁহারা পায়রা পোষেন তাঁহারা জানেন যে বিবিধ জাতীয় পায়রাকে একত্র রাখিয়া কত বিচিত্র রকমের পায়রার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকল পায়রার কোন জাতির খুঁটি খুব বড় ও চিকণ, কাহারও পাখা খুব বিস্তৃত, কাহারও ঠোঁট বড় বা ছোট, কেহ বা দূরে উড়িয়া যাইতে পারে, কেহ পারে না। এই সকল বিবিধ জাতির পায়রা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের দেহের হাড়ের ও অন্ত্রান্ত্র ইন্দ্రిয়ের অনেক তারতম্য হইয়া গিয়াছে। নির্বাচনের দ্বারা গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে নিউক্যাউল্যাণ্ড জাতীয় স্মৃহং কুকুর হইতে গ্রাম্য ক্ষুদ্র খেঁকি কুকুর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ এইরূপ নির্বাচন করিয়া অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর মধ্যে বিবিধ উপগণের উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। বোড়া ও গাধার সহবাসে খচ্চর নামক উপগণের উৎপত্তির কথা সকলেই জানেন।

যখন দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনের দ্বারা বিবিধ উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন, তখন প্রকৃতি যে যুগযুগান্তর হইতে গণ হইতে উপগণ, উপগণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? মানব অল্প সময়ের মধ্যে উপগণে যখন এত পরিবর্তন করিতে সক্ষম, তখন প্রকৃতি নির্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ উপগণের মধ্যে কত

বৃহৎ পরিবর্তন করিতে পারে তাহা অনায়াসে বুঝা যায়—
এত পরিবর্তন সম্ভবপর যে ক্রমশঃ উপগণগুলি একেবারে
স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ নির্বাচন ও
ক্রমবিবর্তনের দ্বারা পৃথিবীর অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও
বৃক্ষলতার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নানা জাত ও অজাত উপায়ে
প্রকৃতি নির্বাচনের দ্বারা উপগণের সৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ
কয়েকটি উপায় এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

(Natural Surroundings)

মনে করুন এক স্থানে ব্যাঘ্রের দল আছে এবং
তাহাদের প্রধান আহার হরিণ। এস্থলে এই সকল ব্যাঘ্রের
মধ্যে যাহারা খুব দ্রুতগামী তাহারাই হরিণ বধ করিয়া
সেই আহারের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। এইরূপ দেশে
দ্রুতগামী লম্বাকৃতি ক্ষীণতম ব্যাঘ্রই প্রকৃতির নির্বাচনফলে
দেখিতে পাওয়া যাইবে, অল্প জাতীয় ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া
যাইবে না। শীতদেশের জীবজন্তু বা বৃক্ষলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে
আনীত হইলে, যেগুলি বাঁচিবে, তাহাদের অনেকগুলি নূতন
স্থানের ও জলবায়ুর উপযোগী হইতে চেষ্টা করিবে।
তাহারা কোন কোনও স্থলে নূতন উপগণে পরিণত হইবে।
অনেকে পাহাড়ে বেলগাছ দেখিয়া থাকিবেন—দেখিতে ছোট,
শক্ত ও সাধারণ বেলগাছ হইতে কতক পরিমাণে ভিন্নাকৃতি।
সমতল ক্ষেত্রজাত বেলের বীচিই পাহাড়ের উপর পক্ষীর দ্বারা

নীত হওয়াতেই এই গাছের উৎপত্তি, কিন্তু পাহাড়ে যেসকল
খাদ্য মিলে সেই খাদ্যের এবং তথাকার জলবায়ুর উপযোগী
হইবার চেষ্টায় বৃক্ষটি কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাকৃতি হইয়াছে।
এইরূপ স্থান বা জলবায়ুর দরুণ এক এক স্থানের, বিশেষতঃ
সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপের বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু অনেক পরিমাণে
স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক নির্বাচন যে কত জটিল তাহা নিম্নলিখিত
উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। বিলাতে হার্টইস্ ও ডাচ
ক্লভার নামক দুইটি উদ্ভিদ আছে। মক্ষিকা ও কীটপতঙ্গের দ্বারা
উদ্ভিদের পুং-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলে আনীত হইলে সেই সঙ্গমে
বীজ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দুইটি ফুলে অম্বল-বী নামক
মক্ষিকাই সঞ্চরণ করে। কিন্তু ইহুরে এই মক্ষিকার বাসা
ভাস্কিয়া ফেলে, অপরদিকে বিড়ালে ইহুর ধরিয়া খায়। যে
প্রদেশে বিড়াল বেশী, সেইখানে ইহুরের সংখ্যা কম,
মক্ষিকার সংখ্যা বেশী এবং সেইজন্তু ফুলও সেখানে বেশী
ফুটিবে। আবার বিড়ালের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে
ইহুর বেশী, সেইজন্তু মক্ষিকা কম, ফুলও কম ফুটিবে।
অতএব কোনও প্রদেশে উপরোক্ত দুই জাতীয় ফুলের সংখ্যা
সেইস্থানের বিড়ালের সংখ্যার উপর নির্ভর করিতেছে।

ইন্দ্রিয়বিশেষের ব্যবহার ও অব্যবহার।

(Use and disuse of parts)

অনেক ইন্দ্রিয় অব্যবহারে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায় ও
ব্যবহারে পরিবর্তিত হয়। যে ইন্দ্রিয় কার্যোপযোগী (useful)
তাহাই স্থায়ী হয়। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত আমরা গৃহপালিত পশু

পক্ষীতে পাই। একই জন্ত বহু অবস্থায় ও গৃহপালিত অবস্থায় পৃথক হয় এবং তাহাদের বংশধরগণও আরও পৃথক হইয়া পড়ে। বহু কুকুট, পাতিহাঁস, রাজহাঁস প্রভৃতি পক্ষী বেশ উড়িতে পারে, গৃহপালিত অবস্থায় তাহাদের উড়িবার প্রয়োজন হয় না—সেইজন্ত ক্রমশঃ তাহাদের পাখার হাড়গুলি এইরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, তাহাদের বেশী দূর উড়িয়া যাইবার ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তাহাদের সন্তানগণ আর উড়িতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পক্ষীদিগকে প্রাণভয়ে উড়িতে হয় না বলিয়া, পাখাবিহীন বা অল্প পাখাবিশিষ্ট পক্ষীও দৃষ্ট হয়। গৃহপালিত অনেক পক্ষীর কানগুলি নিম্নদিকে বাঁকান, কিন্তু বহু অবস্থায় তাহাদের কান সোজা দেখা যায়। গৃহপালিত অবস্থায় তাহারা তেমন ভয় আদৌ পায় না এবং সেইজন্ত কান খাড়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করাতে তাহাদের কানের হাড়গুলি এরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, কানগুলি দোমড়ান অবস্থাতেই স্বভাবতঃ থাকে। তাহাদের সন্তানগুলি উত্তরাধিকারস্বত্বে এইরূপ দোমড়ান কানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। গুবুরে পোকের (Beetles) চরিবার সময় পাগুলি প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্ত তাহাদের সন্তানগুলিতে ক্রমশঃ পা লোপ পাইয়া যায়। ওয়ালথন নামক একজন সাহেব একস্থানে দেখিয়াছিলেন যে, ৫৫০ প্রকার গুবুরে পোকের মধ্যে ২০০ পোকের ডানা এত ছোট হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা উড়িতেই পারে না। এইরূপ অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়ের অব্যবহার ও আবশ্যক ইন্দ্রিয়ের বহুল ব্যবহার বিবিধ উপগণ উৎপাদনের সহায়তা করে।

সুন্দর সুন্দর ফুলের যে বিচিত্র রং দেখিতে পাই, তাহা কেবল মানবের চক্ষুর আনন্দোৎপাদন করিবে বলিয়া সৃজিত হয় নাই, সেই বিচিত্র রং উদ্ভিদের জীবন ও বংশরক্ষার জন্ত বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। ফার, ওক, অ্যাশ, ঘাস প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের বীজ বায়ুর সাহায্যে উৎপন্ন হয়, তাহাদের ফুল রঙ্গিন হয় না। কিন্তু যে সকল উদ্ভিদের ফুলের রেণু-বহনের জন্ত মক্ষিকা বা কীটপতঙ্গের সাহায্য প্রয়োজন, উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত সেই সকল ফুলের রং বিচিত্রবর্ণের হইয়া থাকে। আম, আপেল, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ পক ফলের বিভিন্ন রংও সেই সকল বৃক্ষলতার বংশ-রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয়। পক্ষী ও জন্তুগণ তাহাদের ফলের রঙের দ্বারা প্রথমে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া তাহাদের অত রং। এইরূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে অনেক জন্তুর পুরুষজাতির বিচিত্র বর্ণের পাখা আছে, পুরুষ সিংহের কেশর আছে, ময়ূরের প্যাথন আছে, মোরগের ঝুঁটি আছে, কিন্তু এই সকল জন্তুর স্ত্রীজাতির এরূপ নাই। পুরুষ জন্তুদের এই সৌন্দর্য্য তাহাদের বংশরক্ষার কল্পে প্রয়োজনীয়। রূপ দেখাইয়া পুরুষ-জন্তু স্ত্রী-জন্তুর মন ভুলাইয়া তাহাদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করে। আবার অনেক পক্ষীর স্ত্রী ও পুরুষজাতি—দুইয়েরই পক্ষের সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য স্ত্রীপক্ষির পুরুষের নিকট যৌননির্বাচনের (sexual selection) দ্বারা উত্তরাধিকারীস্বত্রে পাইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার জন্ত

প্রত্যেক ইঞ্জিয়ার এক একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ইঞ্জিয়ার জীবনযাত্রার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকিবে এবং নূতন উপগণের সৃষ্টি হইবে।

জারজনন।

(Intercrossing)

বিবিধ প্রকারের বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজননেও উপগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবশ্য সকল প্রকার বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষীর মধ্যে জারজনন আনৌ সম্ভবপর নহে। পূর্বে অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস ছিল যে জারজননের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানগণের আর সন্তান হয় না। ডার্কইন দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই সিদ্ধান্ত অনেকস্থলে সত্য নহে। উপরন্তু অনেক স্থলে জারজননের দ্বারা সন্তান আরও বেশী সবল ও সতেজ হয়। বৃক্ষলতাদের মধ্যে এই জারজনন কীটপতঙ্গ কর্তৃক রেণু বহনের দ্বারা সঞ্চাৰিত হয়। ডার্কইন দেখিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রকারের কপি, মুলা, পেয়াজ ও অন্যান্য সবজী একসঙ্গে পুঁতিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ হইতে সবজী উৎপন্ন করিলে তাহাদের অনেক-গুলি পরিবর্তিত হয়। তিনি এইরূপে ২৩টি কপির চারা রোপণ করিয়া দেখিলেন যে মাত্র ৭২টি চারা ঠিক আছে, বাকি চারাগুলি হইতে উৎপন্ন ফুল কতক পরিমাণে পৃথক হইয়া গিয়াছে। শশক ও খরগোসের সংযোগে যে জার উৎপন্ন হয় তাহা বন্ধ্য (sterile) নহে, শশক বা খরগোসের সংযোগে তাহার বহু সন্তান হইয়া থাকে। সাধারণ

রাজহাঁস ও চীনদেশীয় রাজহাঁসকে প্রাণীবিজ্ঞাবিশারদেৱা বিভিন্ন গণে ফেলিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে যে জার উৎপন্ন হয় তাহারও সন্তান উৎপাদনের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। গৃহপালিত বিবিধ প্রকারের পায়রা, কুকুর, গরু, মহিষের মধ্যে জ্ঞা ও পুরুষের সংসর্গে যে সন্তান হয় তাহা আদৌ বন্ধ্যা নহে। এইরূপ জারজননের দ্বারা বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের মধ্যে অনেক প্রকারের উপগণের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

এইরূপ নানা জাত ও অজাত কারণে প্রকৃতি নির্বাচন করিয়া একই গণ হইতে উপগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ল্যামার্ক স্বীকার করিয়াছেন যে পশুপক্ষীগণ কয়েকটি আদি জন্তু হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তাহার মত গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার কারণ, তিনি দেখাইতে পারেন নাই যে কেমন করিয়া একই গণ হইতে বিবিধ পশুপক্ষীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। ডার্বাইন এই প্রশ্নের সমাধান করিলেন—প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা ক্রমশঃ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মধ্যে এত পার্থক্য সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি দেখাইলেন যে, উপগণের আর পরিবর্তন হয় না, তাহারা চিরস্থায়ী (immutable)—এই মত ব্রাস্ত। আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র উপগণের যাহা গণ, তাহাই আবার বৃহত্তর গণের উপগণ। এইরূপে ডার্বাইন সিদ্ধান্ত করিলেন যে পশুপক্ষী এই ক্রমবিবর্তনের ফলে চারি পাঁচটি বৃহৎ গণ হইতে উৎপন্ন এবং বৃক্ষলতাও তদ্রূপভাবেই সৃষ্ট।

ডার্বাইনের এই মত প্রথমতঃ কেহই গ্রাহ্য করিলেন না। যিনি একটা বড় রকমের নূতন কথা প্রথম বলেন, তিনি

পাগলই ত বটে। ডারুইনও প্রথম প্রথম অনেক গালি খাইলেন। ক্রমশঃ লায়েল-প্রমুখ বিখ্যাত ভূবিজ্ঞাবিদ, হাক্সলে প্রমুখ প্রাণীবিজ্ঞাবিদ, হকারের মত উদ্ভিদবিজ্ঞাবিদেরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন। আধুনিক কালে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মত অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমবিবর্তনের দ্বারা বৃক্ষলতা ও জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে ডারুইন যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা অটুট আছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্ত কত বৈজ্ঞানিক কত নতুন পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সকল পরীক্ষার দ্বারা ভূবিজ্ঞা, উদ্ভিদবিজ্ঞা ও প্রাণিবিজ্ঞা বহুল পরিমাণে উন্নত হইয়াছে।

মানবের উৎপত্তি।

(Descent of man)

ডারুইন বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীদের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার “উপগণের উৎপত্তি” নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। মানব শ্রেষ্ঠ জীব, সেইজন্য তাহার উৎপত্তির বিষয় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে মানব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও মানব অত্যাশ্রয় জীব হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে।

প্রথমতঃ—মানবের দৈহিক গঠন অত্যাশ্রয় উচ্চশ্রেণীর জীবের দৈহিকগঠন হইতে একেবারে পৃথক নহে। মানবশরীরের হাড়, পেশী, স্নায়ু, রক্তস্থলী প্রভৃতি বানর, বাহুড় বা সিল

মৎস্যের ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত তুলনীয়। হাক্সলে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, জীবের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর সহিত বানরজাতীয় জীবগণের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালীর অনেক সাদৃশ্য আছে, তবে ঐ সাদৃশ্য একেবারে সম্পূর্ণ নহে, তাহা হইলে বানর ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তি সমান হইত। দৈহিক গঠনে সাধারণ বানর, সিম্পাঞ্জি, ওরাং প্রভৃতি বানর জাতীয় জীবের সহিত মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী।

অপুষ্ট জগাবস্থায় কুকুর প্রভৃতি মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগণের জগ হইতে সহজে মানব-জগের পার্থক্য অনুমিত হয় না। ক্রমশঃ একই প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে পক্ষীর ডানা ও পা এবং মানুষেরও হাত ও পা বাহির হয়। জগের পরিণতির সময়ই এই সকল জীবের পার্থক্য অনুভূত হয়। এইরূপ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক সত্য।

বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবিধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা মানব অবশ্য অগ্নাগ্র জীব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অগ্নাগ্র জীবের যে বুদ্ধিবৃত্তি নাই বা তাহারা ভালবাসিতে, রাগিতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে, অনুকরণ করিতে, প্রতিশোধ লইতে বা ভাবিতে একেবারেই জানে না এমন নহে। দুই একটি উদাহরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি সর্বজন-বিদিত। চক্রবাক চক্রবাকীর দাম্পত্য-প্রেম কবিকল্পনা নহে, সম্পূর্ণ সত্য। জননীর সন্তানের উপর স্নেহ যেমন মানব সমাজে দেখা যায়, জীবজগতেও ঠিক সেইরূপই দৃষ্ট হয়।

বংশস্হারা গাভীর করুণ রোদন যিনি শুনিয়াছেন তিনি একথা অস্বীকার করিবেন না। অলু করণ করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনেক পশুতে দৃষ্ট হয়। ময়না বা কাকাতুয়া “রাধাকৃষ্ণ” পড়ে, বানরে সাষ্টাঙ্গে সেলাম করে, বিবিধ জন্তুতে বিবিধ মানবোচিত ক্রীড়া প্রদর্শন করে। পশুদের যে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চিড়িয়াখানায় হাতীর নিকট কোনও জিনিস ফেলিয়া দিলে উহা শুঁড়ের দ্বারা না পাইলে জিনিসের অপর পারে বায়ু-নিঃসরণ করিতে থাকে যাহাতে বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া জিনিসটা তাহার আয়ত্তে আইসে। একজন সাহেব ভায়েনা সহরে দেখিয়াছিলেন যে, একটি ভল্লুক নিকটবর্তী জলে এক-টুকরা রুটি ভাসিতে দেখিয়া তাহা পাইবার জন্তু থাবা দিয়া একটি ছোট নালা কাটিয়া জল ও তাহার সঙ্গে রুটির টুকরাও নিকটে আনয়ন করিয়াছিল।

ডারুইন জীবজন্তুদিগের এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্তর উদাহরণ দিয়াছেন। বানর জাতির বুদ্ধিবৃত্তি মানবের বুদ্ধিবৃত্তির অতি নিকট। অনেকে মনে করেন, মানুষই কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বন্য সিম্পাঞ্জি পাথরের দ্বারা ফল ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের শাঁস খায়। রেংগার নামক এক সাহেব একটি বানরকে এইরূপ শক্ত কাঁচা তাল ভাঙ্গিয়া তাহার রস খাইতে শিখাইয়াছিলেন। হাতীরা গাছের ভাল ভাঙ্গিয়া মাছি তাড়াইতে থাকে। একবার এবিসিনিয়া দেশে একটি পার্শ্বত্যা পথে কোবার্গ গোথার ডিউকের সহচরেরা পর্বতের উপরিস্থিত একদল বানরের

প্রতি গুলি করিতেছিলেন। বানরেরা তখন একজোটে তাঁহাদের উপর মানুষের মাথার মত বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ফেলিয়া তাঁহা-
দিগকে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিল। স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি উচ্চ
মানসিক বৃত্তিও কতক কতক পরিমাণে জন্তুদের মধ্যে আছে।
ডারুইনের একটি পোষা কুকুর ছিল। তিনি ইচ্ছা করিয়া
উহাকে পাঁচ বৎসর বাঁধিয়া রাখিবার পর একদিন তাহার
নিকট প্রত্যাগমন করিলে প্রথম কুকুরটা তাঁহাকে চিনিতে
পারিল না; তাহার পর হঠাৎ তাহার স্মরণ হওয়াতে
ডারুইনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বেকার মত আসিতে লাগিল।
অবশ্য ভাষা মানবকে উচ্চতম জীব করিয়া রাখিয়াছে। তবে
জন্তুদিগের মধ্যে ভাষার যে প্রচলন একেবারে নাই তাহা
নহে। বিবিধ প্রকারের শব্দের দ্বারা তাহারা মনোভাব
প্রকাশ করে। তাহাদের ক্রোধ ও ক্রন্দনের ভাষা যে স্বতন্ত্র
তাহা বেশ বুঝা যায়। অবশ্য মানব যেরূপ তাহার সকল
ভাবই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে জন্তুরা তাহা পারে না।
মানবের লিখিবার শক্তি চর্চা ও আলোচনার ফলে। ইহার
বলে তাহারা পশু হইতে বহু উচ্চে, কিন্তু অসভ্যজাতিদের
লিখিত ভাষা নাই।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান যে মানব সমাজেই নিবদ্ধ তাহা নহে।
অন্তান্ত অনেক জন্তুতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিद्यমান। ময়ূরের
সুন্দর পাখা ময়ূরীর পছন্দের জন্ত, মানবের চক্ষুরিস্থির
তৃপ্তির জন্ত নহে। অনেক পুং-পক্ষী স্ত্রী-পক্ষীর মনোরঞ্জনার্থ
বিবিধ প্রকারের গান করিয়া থাকে। মানবের মধ্যে এই
সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সঙ্গীতপ্রিয়তা যে সমান নহে, তাহার প্রমাণ

অসভ্যজাতির বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বেশভূষা সভ্যজাতির নিকট আদৌ প্রিয় নহে। সকল জাতির সঙ্গীতপ্রণালী আদৌ এক নহে।

ভগবানে বিশ্বাস অনেকে মানবজাতির নিজস্ব পার্থক্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বিশ্বাস যে মানবের অনিবার্য প্রবৃত্তি-মূলক তাহা নহে, কারণ ডার্কইন ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখাইয়াছেন যে অনেক অসভ্যজাতিদের মধ্যে ভগবানে বিশ্বাস নাই। ভগবানে বিশ্বাস ও ধর্ম মানবজাতির উন্নতি ও শিক্ষার সহিত ক্রমশঃ মানব সমাজে স্থান পাইয়াছে।

পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও সামাজিক বন্ধন কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা শিকার করেন তাঁহারা জানেন যে বৃহৎ নদীর চড়ে একসঙ্গে হাজার হাজার রাজহাঁস, পাতিহাঁস, পায়রা, চক্রবাক বাস করে। বানরেরা যখন বাগান লুট করিতে যায় তখন তাহারা সাধারণতঃ একজন দলপতির আদেশে কার্য্য করিয়া থাকে। একই পালে গরু, ভেড়া, ছাগল চরিতে অনেকেই দেখিয়াছেন।

এইরূপে ডার্কইন দেখাইয়াছেন যে শরীরের গঠনপ্রণালী, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক ক্রিয়াতে মানব অত্যাশ্চর্য্য জন্তু হইতে একেবারে স্বতন্ত্র নহে। উচ্চ মানসিক বৃত্তি মানব সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার দরুণ খুব বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়াতে মানবকে এত উচ্চ জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়; নহিলে আফ্রিকার অনেক অসভ্য মানব জাতি ও উচ্চশ্রেণীর বানর জাতিতে বিশেষ তফাৎ একটা নাই বলিলেও চলে। সেইজন্য ডার্কইন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে মানবই প্রথম জীবরূপে

